'রা—স্বা'

শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার চক্রবর্তী
শ্রীযুক্তা স্নেহলতা চক্রবর্তী
শ্রীচরণেষু

যত্রাস্থেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রি কৈঃ সহ সরাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥

এই লেখকের অন্যান্য বই :

- ঘুণপোকা
- পারাপার
- উজান
- ফেরা
- শূন্যের উদ্যান
- বৃষ্টির ঘ্রাণ
- নয়নশ্যামা
- পাপ
- নির্বাচিত গল্প

॥ এক ॥

শেষ ক্লাশটা সেরে জগন্নাথ করিডোর দিয়ে স্টাফ-রুমের দিকে ফিরছিল। দূর থেকেই দেখল বারান্দার রেলিঙে ঠেস দিয়ে এক অদ্ভুত মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। পরনে আধময়লা হ্যাণ্ডলুমের চেক শার্ট খাকি প্যাণ্ট, কাঁধে রুক-স্যাক্, একগাল দাড়ি। একটু কাছে আসতেই শ্লথ গতিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসল, বলল—হ্যালো। একটু চমকে গিয়েছিল সে, পরমুহূর্তেই হেসে ফেলল। বলল—অপদার্থ। কোথা থেকে ফিরলি ?

অরিজিৎ হাসিমুখে তাকিয়েছিল জগন্নাথের দিকে। একটু চুপ করে থেকে বলল—তোর জন্য প্রায় চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি।

—দাঁড়িয়ে কেন ? জগন্নাথ ভ্রু কুঁচকে বলে—স্টাফ-রুমে বসলেই তো পারতিস।

চোখ বিস্ফারিত করে নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে অরিজিৎ বলে—এই বেশে ?

ওর বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা টেনে নিয়ে সামান্য একটু চাপ দিয়েই ছেড়ে দেয় সে—আজই ফিরলি ?

—এইমাত্র। হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা আসছি, মালপত্র স্টেশনে জমা রেখে। বলে হাসল অরিজিৎ—ফিরছি অমরনাথ থেকে।

একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল জগন্নাথকে, ভ্রু সামান্য কোঁচকানো, বলল—বাড়ীতে যাসনি ?

—যাব। অরিজিৎ জগন্নাথের কাঁধের দিকে হাত বাড়িয়েছিল, কি ভেবে হাতটা টেনে নিয়ে বলল—অনেক কথা আছে। এখন আর ক্লাশ আছে তোর ?

—না। জগন্নাথ মাথা নাড়ে। অরিজিতের দিকে খানিকক্ষণ শূন্য

চোখে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলে—কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াস এখানো বয়স হয়নি তোর ?

—মা-মাসীর মতো কথা বলছিস। একটু থেমে থেকে বলল—এখানে কথা হয় না। তোর ছাত্ররা ঘুরছে চারদিকে ; আমাকে বার বার ক'রে দেখে যাচ্ছিল সবাই। তার চেয়ে চল্ বেরিয়ে পড়ি।

—চল্। বলে একটু থমকে গেল জগন্নাথ—কিন্তু অতদূর থেকে ফিরলি, তোর টায়ার্ড লাগছে না ?

—দূর! আবার হাসল অরিজিৎ। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। জগন্নাথ আগেও দেখেছে, এখনো লক্ষ্য করল অরিজিতের হাটার ধরণটা আলাদা। বেশ রোগা অরিজিত, মাথায় অনেকটা লম্বা, কোলকুঁজো। হাঁটার সময় আরো ঝুঁকে পড়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে হাঁটে, প্রায় নিঃশব্দে খুব দ্রুতবেগে হাঁটতে পারে। সে সময়ে কেমন একটা আক্রোশ আর আক্রমণের ভঙ্গী ফুটে ওঠে ওর শরীরে। অনেকদিন ধরে হাঁটছে অরিজিৎ, ঘুরে বেড়াচ্ছে পাহাড়ে, সমুদ্রে, অরণ্যে। রোদে পুড়ে ওর মুখ আর হাতের চামড়ার রঙ বাদামী, কিন্তু জামা খুললে ওর শ্বেত পাথরের মতো শরীর দেখা যায়। কেমন পাকিয়ে গেছে শরীর, মুখ আরো শ্রীহীন হয়েছে, তবু জগন্নাথ জানে ওর শরীর পালকের মতো হাল্কা, চিতাবাঘের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন, অসম্ভব সহনশীল।

নিঃশব্দে হেঁটে দুজনে কলেজের বাইরে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। হাওয়া দিচ্ছে খুব। জগন্নাথের পাঞ্জাবী ফুরফুর করে উড়ছিল। অরিজিৎ হাঁ করে বড় নিঃশ্বাস ফেলল—কলকাতায় এসে গরম লাগছে খুব। কোন দিকে যাওয়া যায় বল্ তো!

—সে তোকে ভাবতে হবে না। জগন্নাথ ভ্রু কুঁচকে বলল। খালি ট্যাক্সির জন্য রাস্তার এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল সে।

—কি খুঁজছিস ? অরিজিৎ প্রশ্ন করে।

—ট্যাক্সি।

—কি হবে!

—যা চেহারা করেছ—জগন্নাথ দাঁতে দাঁত চেপে বলে—তোমার সঙ্গে ট্রামে বাসে ওঠা যায় না।

—ঠিক কথা। অরিজিৎ হাসে—কিন্তু নিয়ে যাবি কোথায়? তোর বাসায়?

—নয় কেন?

—দূর! অরিজিৎ চাপা গলায় বলে—তোর নতুন বৌ আমাকে দেখে ভয় পেয়ে যাবে। এ পোষাকে নয়, একটু ভদ্রস্থ হয়ে নি আগে, তারপর যাওয়া যাবে।

কথাটা ভেবে দেখল জগন্নাথ, তারপর হেসে ফেলে বলে—খুব মন্দ বলিসনি। আমিও প্রথমটায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তবু চল তো, তোকে দিয়ে একটা 'শক্' দেওয়া যাক ওকে।

—না ভাই। হাত জোড় করে অরিজিৎ—এ দানটা ছেড়ে দে।

ভ্রু কুঁচকে জগন্নাথ বলে—তবে কোন দিকে যাবি, অপদার্থ?

অরিজিৎ কপালের ঘাম হাত দিয়ে মুছে বলল—কোথাও গিয়ে বসা যাক।

—কোথায়! রেস্টুরেন্টে?

—দূর!

তাহলে?

একটু ভেবে নিয়ে অরিজিৎ বলল—ময়দানের দিকে চল্। ফাঁকা মাঠ আছে, গাছতলায় বসলে গঙ্গার হাওয়া লাগবে।

জগন্নাথ অরিজিতের দিকে চোখ ছোট করে তাকাল—বাস্তবিক, এতদূর ট্রেনজার্নি করে টায়ার্ড লাগছে না তোর? আমার তো চারটে ক্লাশ করলে হাঁফ ধরে যায়।

—ট্রাম আসছে। এই বলে অরিজিৎ লম্বা হাত বাড়িয়ে জগন্নাথের একটা হাত শক্ত করে ধরল—আয়। চমকে উঠল জগন্নাথ, অরিজিতের হাতটা থরথর করে কাঁপছে। পরমুহূর্তেই ছেড়ে দিল।

টার্মিনাসে ট্রাম থামতে নেমে পড়ল দু'জন। এলোমেলো হাওয়া

দিচ্ছে, শরতের রোদ নিস্তেজ। ভাল লাগছিল জগন্নাথের। বলল—এমন হুট্ করে আসিস আর চলে যাস যে তোর তাল পাওয়া যায় না

—এই তো ভাল। বলতে বলতে পকেট থেকে একটা রোদ চশমা বের করে চোখে পরে নিল অরিজিৎ। সঙ্গে সঙ্গে ভূতুড়ে হয়ে গেল ওর মুখ। সম্পূর্ণ অচেনা। বলল—চোখটা ট্রাবল্ দিচ্ছে, বুঝলি! সন্দেহ হয়, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি না তো! বলে হাসল।

বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে খোলা ময়দান, যতদূর চোখ যায় সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মানুষ। এখানে কি করছে এরা তা জগন্নাথ ভেবে পায় না। অভ্যাসবশতঃ জোরে হাঁটছিল অরিজিৎ, তাল রাখতে গিয়ে জগন্নাথ ক্রমশঃ অনুভব করে যে তার হাঁফ ধরে যাচ্ছে। তাই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে, অরিজিৎ এগিয়ে গিয়েছিল মুখ ফিরিয়ে নিল—কি হল রে?

—কিছু না। জগন্নাথ একটা শ্বাস ফেলে বলে—অত জোরে হাঁটছিস কেন?

—অভ্যেস।

—আমি পারি না!

—তোমার সুখের শরীর। বলে হাসল অরিজিৎ—বিয়ে করে আরো চ্যাপ্সা হয়ে গেছিস। বলতে বলতে কাছে এসে দাঁড়িয়ে দু হাত হঠাৎ ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—অনেকদিন পর বড় ভাল লাগছে।

—কি?

—এই আকাশ, বাতাস, মাটি, মনুমেন্ট—এই সব আর কি! তোকেও।

জগন্নাথ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অরিজিতের মুখের দিকে চেয়ে। অস্পষ্টভাবে সে একটা কিছু টের পাচ্ছিল। এর আগেও বাইরে গেছে, ফিরে এসেছে অরিজিৎ, দেখা করেছে জগন্নাথের সঙ্গে। কিন্তু এখন সে কোথায় যেন অরিজিতের ভাঙচুরের আভাষ পাচ্ছিল। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু নিশ্চিত কোথাও অসঙ্গতি রয়েছে।

জগন্নাথ আস্তে আস্তে বলল—কি কথা ছিল তোর যার জন্য এতদূর টেনে আনলি ?

—কথা! স্নায়ুতন্ত্রীর বিকার থেকে যে ভাবে হাসে লোকে সেভাবে হঠাৎ হাসল অরিজিৎ, গভীর শ্বাস টেনে বলল—আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

মরা আলোর পশ্চিমে আকাশের দিকে পিছন ফিরে অরিজিৎ দাঁড়িয়েছিল। অদূরেই সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এ পাশ থেকে ওর মুখ দেখাচ্ছিল কালো ব্রোঞ্জে গঠিত। কাঁধে রুক-স্যাক, পায়ে নোংরা বিবর্ণ হান্টিং বুট, কাপড় জামা ময়লা, গালে দাড়ি, বড়ো বড়ো চুল কপাল ছেয়ে পড়ে আছে—দীর্ঘ পথ অতিক্রমের সমস্ত চিহ্ন রয়েছে তার চেহারায়, তবু জগন্নাথের মনে হল সদ্য গ্রীণরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে অরিজিৎ, খোলা মাঠে ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ ভাঁড়ের মতো দেখাচ্ছে তাকে। জগন্নাথ আস্তে আস্তে বলল—তোমার বয়স তো ত বছর করে বাড়ছে না!

তেমনি বিকার থেকেই যেন হাসল অরিজিৎ। একটা গোপন কিছু ঢাকা দেওয়ার জন্যই যেন তাড়াতাড়ি বলল—আমার নার্ভগুলো বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে, অল্পেই শরীর মন কেমন কাঁপতে থাকে। বেনারসে একবার ভয়ঙ্কর পেটের ব্যথায় পড়েছিলাম কিছুদিন। সেই থেকেই দেখছি—

জগন্নাথ হাসল, নিষ্প্রাণ হাসি। বলল—আর কোনো কথা ছিল না তোর ?

মাথা নাড়ে অরিজিৎ। না। কিন্তু তার মুখ দেখে জগন্নাথের মনে হল ভয়ঙ্কর এক ধরণের অস্থিরতা চেপে রাখতে গিয়ে কষ্ট হচ্ছে ওর। বড় বেদনার্ত দেখাল ওর মুখ। একটু আগে যার সঙ্গে ট্রাম থেকে নামল এ সে অরিজিৎ নয়। জগন্নাথ বলল—আমার সঙ্গে আয়।

একটু ইতস্তত: করল অরিজিৎ, পরমুহূর্তেই মাথা নামিয়ে নিয়ে

আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল, জিজ্ঞেসও করল না কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে জগন্নাথ।

ফেরার সময় ট্যাক্সি ধরল জগন্নাথ। সারা রাস্তা দুজনেই নিঃশব্দে বাইরে চেয়ে রইল।

—আপনাকে দেখায় অনেকটা সোলজারের মতো। বলে বনলতা হাসছিল। টেবিলের ওপর একটিমাত্র টেবিল ল্যাম্প জ্বলছিল, সে আলোটাও অর্দ্ধেক আড়াল করে টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বনলতা। সারা ঘরে অন্ধকার ছড়িয়ে আছে।

—সোলজার? কথাটা বলে একটু ভাবতে থাকে অরিজিৎ।

—সোলজার। বনলতা বলল—ফ্রন্ট থেকে ফিরে আসবার পর অবশ্য।

খোলা গলায় হাসে অরিজিৎ—ফ্রন্ট থেকে মার খেয়ে হেরে ফিরে আসবার পর। না? কোণের চেয়ারে বসে জগন্নাথ অরিজিতকে দেখছিল। সারাদিন পর স্নান করেছে অরিজিৎ, বনলতা খাবার করে খাওয়াল। এখন তৃপ্ত ও খুশী দেখাচ্ছে অরিজিৎকে। স্মিত মুখে জগন্নাথ চেয়ে ছিল, কিন্তু অরিজিৎ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যাচ্ছে তার চোখ।

—মার খেয়েই তো। যা চেহারা করে এসেছিলেন, আমি ত প্রথমে চমকে উঠেছিলুম। বনলতা বলল।

মাথা নামিয়ে নিয়ে লাজুক গলায় বলে অরিজিৎ—আমার দোষ নেই। জগন্নাথকে জিজ্ঞেস করুন, আমি প্রথমটায় ঐ ভয়েই আসতে চাইনি।

—বাঃ! বনলতা খোঁপায় হাত তুলল—আমি চমকে যাবো বলে আপনি বন্ধুর বাসায় আসবেন না? দেখবেন না কেমন নতুন সংসার পেতেছে আপনার বন্ধু?

—দেখব না কেন ? কিন্তু তার জন্য সময় নেওয়া উচিত ছিল। বলতে বলতে আবার একটু অস্থির বোধ করে অরিজিৎ—দেখুন কেমন জংলীর মতো এসেছি, প্রথম দেখা আপনার সঙ্গে অথচ একটা উপহারও নিয়ে আসিনি হাতে করে।

—তাতে কি ? বনলতা ঠাট্টার ছলে যেন খেলছে অরিজিৎকে নিয়ে, পরে দেবেন। আমি খুব নির্লোভ নই, উপহার পেতে ভালবাসি।

—দেব। অবশ্যই দেব। নির্বোধের মতোই খানিকটা প্রতিজ্ঞা করার ভঙ্গীতে বিড় বিড় করল অরিজিৎ—ভাবছি কি দেওয়া যায় ! কিসে মানায় আপনাকে !

একটু চাপা হাসি মুখে বনলতা জগন্নাথের দিকে, হাল্কা গলায় অরিজিৎকে বলে—যা খুশী। আপনার রুক স্যাকটাই দিয়ে যান না। আর সেই সঙ্গে কথা দিয়ে যান যে আর রুক-স্যাক কাঁধে নেবেন না।

অরিজিত হাসে—কিন্তু তা হলে আপনাকেই রুক-স্যাক কাঁধে নিতে হয়। চকিতে জগন্নাথের দিকে চেয়ে বলে—তাতে জগন্নাথের কি খুব সুবিধে হবে ?

জগন্নাথ অরিজিৎকেই দেখছিল, সারাক্ষণ কথায় কথায় ওকে নাস্তানাবুদ করেছে বনলতা। অরিজিৎ হাসছে, কিংবা হাসি দিয়ে কিছু চাপা দিচ্ছে। চেয়ারের হাতলের ওপর ওর হাত দেখছিল জগন্নাথ ওর তাকানোর ভঙ্গী দেখছিল, ওর গলার ঈষৎ কর্কশ স্বর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

বনলতা অরিজিতের কথার উত্তরে বলছিল—রুক-স্যাক আমি কাঁধে করলে ওর কোনো ক্ষতি নেই, বৌ বাউণ্ডুলে বলে তাড়াতাড়ি ডিভোর্স পেয়ে যাবে। আমি নেবো কাঁধে, কিন্তু আপনাকেও রুক-স্যাকের বদলে অন্য কিছু কাঁধে নিতে হবে।

—ও তো সেই পুরোনো কথা—অরিজিৎ হাত তুলে থামাল বনলতাকে। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি।

বনলতা একটু থমকে গেল। সামলে নিয়ে পরমুহূর্তেই হেসে বলল—আপনার ভ্রমণকাহিনী কিন্তু একটুও শুনলাম না। কেমন টুরিস্ট আপনি? লোকে লিলুয়া ঘুরে এসে কান ঝালাপালা করে দেয়।

অরিজিৎ হাসে—সেই ভয়েই ত বলিনা। তারপর থেমে থেকে একটু গম্ভীর হয়ে গেল—একটানা গল্প বলে যেতে আমি পারিওনা বলতে বলতে সন্দেহ হয় বলাটা হয়ত ঠিকমতো হচ্ছে না, লোকে বোর্ড হচ্ছে। পরমুহূর্তে হেসে বলল—ওটা একটা আর্ট, লিলুয়া ভ্রমণবৃত্তান্ত বলেও লোককে মুগ্ধ করে রাখা যায়।

বনলতা কি বলতে যাচ্ছিল জগন্নাথ বাধা দিয়ে বলল—ওকে এবার খাইয়ে দাও। অনেক দূর যাবে ও।

বনলতা চলে গেলে কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর প্রথম কথা বলল অরিজিৎ—জগন্নাথ!

—উঁ!

—আমি আবার বেরিয়ে পড়ব। খুব শীগগীরই।

—হুঁ!

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ। অরিজিৎ কিছুক্ষণ চেয়ে সামনের দেয়ালে ক্যালেণ্ডারটা আবছা আলোতে দেখার চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলল—তোর চেয়ে আমি চার বছরের বড় তোর বোধহয় বত্রিশ চলছে; না?

—বোধহয়।

একটু শ্বাস ফেলল অরিজিৎ—বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

একই কথা বার বার বলছিস কেন? তোকে বুড়ো দেখায় না।

—না?

—না।

আবার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হয়, অরিজিৎ বলে—তবু বয়স তো হচ্ছে

—তাতে কি? নিস্পৃহ গলায় জগন্নাথ বলে।

অরিজিৎ হাসে, তেমনি স্নায়বিক বিকারের হাসি—একটু উঁচু-গ্রামে বাঁধা। বলে—আমার কাছে এটাই সবচেয়ে বড় ফ্যাকটর।

—কেন ?

—মৃত্যুভয়! আবার হাসে অরিজিৎ—আমি নাটক করতে ভালবাসি না জগন্নাথ, তবু হয়ত খানিকটা নাটকীয় শোনাবে। আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছি, আর প্রার্থনা করেছি।

—কিসের ?

—যেন আমার মৃত্যু না হয়। অসুস্থতার হাসি হাসে অরিজিৎ—বিয়ে করিনি, হয়ত করবোও না। তবু যদি কখনো করি, তাই আগে থেকে প্রার্থনা করেছি যেন আমার সেই স্ত্রীর মৃত্যু না হয়, অনাগত সন্তানের যাতে মৃত্যু না হয়।

—এর কোনো অর্থ নেই।

সে কথা শুনল না অরিজিৎ, এক গভীর স্বপ্নময়তার ভিতর থেকে বলল—আমি ভাগ্যবান যে প্রিয় আপনজন কেউ নেই। কলকাতার বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে, এবার বিক্রী করে দেব। তারপর—আঃ! বলে মৃদু হাসি মুখে চেয়ারের পিছনে মাথা এলিয়ে দিল অরিজিৎ।

—কি বলছিস ? জগন্নাথ আস্তে আস্তে করে জিজ্ঞেস করে।

—যেন আমার মৃত্যু না হয়! অরিজিৎ অবহেলায় চেয়ে থাকে ঘরের সেই একটাই দেয়ালের দিকে যেটা তার সামনে রয়েছে, বলে—কিন্তু হবেই জগন্নাথ, কে ঠেকাবে তাকে ?

—ঠেকানো যায় না। জগন্নাথ আস্তে বলল।

—সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিলে শুনেছি মৃত্যু হয় না। যদি তাই দিই ?

—কি পাগলের মতো যা তা বলছিস ? জগন্নাথ স্পষ্ট বিরক্তির স্বরে বলে।

হাসল অরিজিৎ—কেন বলছি তা আমি জানিনা। কিন্তু মনে হয়েছিল কাউকে বলা দরকার। না বললে মরে যাবো। বহুদূর

থেকে ছুটতে ছুটতে এলাম তোর কাছে, স্টেশন থেকেই সোজা এলাম, যা কখনো করি না। কেমন অচেনা লাগছিল এই শহর, কেমন অচেনা লাগছিল তোকেও, প্রথমে তাই বলতে পারলাম না, কথা আছে বলে টেনে নিয়ে গেলাম ময়দানে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে জগন্নাথ বলল – চুপ কর।

ভ্রু কুঁচকে অরিজিৎ তাকাল জগন্নাথের দিকে—তুই শুনতে চাস না?

—কি হবে শুনে? আমি তোর অনেক ব্যাপার বুঝি না।

—বুঝিস না?

—না।

কি বলতে গিয়েও বলল না অরিজিৎ। দরজায় অস্পষ্ট বনলতাকে দেখা গেল। হাসি মুখে ঢুকল সে—রেডি, আসুন।

তবু অরিজিৎ খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ অনির্দিষ্ট গলায় প্রশ্ন করল—এখন কটা বাজে?

॥ দুই ॥

—কেমন দেখলেন আমাদের ঘর-সংসার, বললেন না তো ?

—বেশ। রুক-স্যাকের স্ট্র্যাপ বুকে এঁটে নিয়ে ম্লান হাসল অরিজিৎ—তবে বাইরে থেকে তো সব বোঝা যায় না।

বনলতা একটু গম্ভীর হয়ে পরমুহূর্তে হেসে বলল—তা হলে তো বুঝতে গেলে আড়ি পাততে হয়।

—ঠিক। অরিজিৎ হাসল না। সে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল, অন্যমনস্কভাবে একবার বনলতার মুখ দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল—জগন্নাথ প্রায় ফুটপাথের জীবন থেকে উঠে এসেছে এতদূর। বলেনি আপনাকে ? ওর ধৈর্য আছে, আত্মবিশ্বাস আছে, হয়ত আরো ওপরে উঠবে ও। বলতে বলতে থামল অরিজিৎ, মাথা নেড়ে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল—কিন্তু বৃথা। সম্ভবতঃ ঈশ্বরেরও মৃত্যু আছে।

জগন্নাথ বনলতার দিকে চেয়ে চোখের ইশারা করল, তারপর কোমল একখানা হাত রাখল অরিজিতের পিঠে—যাবি না ? রাত হয়ে যাচ্ছে।

—চলি। বনলতার দিকে চেয়ে বলে অরিজিৎ। হাত জোড় করে।

দু'জনে নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটছিল, নিঃঝুম শহরতলীর ভিতরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনি, হচ্ছিল ওদের জুতোর মৃদু শব্দ। অরিজিৎ মুখ নামিয়ে হাঁটছিল, হঠাৎ বলল—তুই আবার এগিয়ে দিতে এলি কেন ?

—ক্ষতি কি ? বলল জগন্নাথ—তা ছাড়া একটা কথাও ছিল।

চকিতে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নেয় অরিজিৎ—কি ?

—যা দেখতে এসেছিলি তা দেখা হয়েছে তোর ?

আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে অরিজিৎ—কি ?

জগন্নাথ হাসল—আমাকে।

—মানে।

জগন্নাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—চল। রাত হয়ে যাচ্ছে।

লম্বা হাত বাড়িয়ে জগন্নাথের একটা হাত চেপে ধরল অরিজিৎ—কি বলছিস বুঝিয়ে বল।

—বললে তুই খুশী হবি না। জগন্নাথ ধীর গলায় বলে—এ সব না বললেই ভাল ছিল।

—তবে শুরু করলি কেন ?

আবার পাশাপাশি হাঁটছিল দু'জন। হাঁটতে হাঁটতে জগন্নাথ নরম গলায় বলল—প্রতিবার ফিরে এসে তুই আমাকে দেখতে আসিস। কেন ?

—তুই-ই বল। অরিজিৎ গম্ভীর হয়ে বলল।

—বলব! জগন্নাথ অন্ধকারে ম্লান হাসে। ছেলেবেলা থেকেই তুই আমাকে ঘেন্না করিস বলে।

অরিজিৎ উত্তর দেবার জন্য মুখ ফেরালে হাত তুলে জগন্নাথ তাকে চুপ থাকতে ইশারা করল। বলল—ফুটপাথের জীবন থেকে উঠে এসেছি আমি, তুই বললি, ঠিক কথা। খুব নীচু তলা থেকে আমি আস্তে আস্তে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করেছি। আমার ধৈর্য ছিল, সাধ ছিল, চেষ্টা ছিল। আর তোর সব ছিল, তবু তুই সব ছেড়ে ছুড়ে বাউণ্ডুলে হয়ে গেলি। কিন্তু তুই ভাবিস ঐখানে তোর জিৎ, তোর অহঙ্কার! তুই হাফ সন্ন্যাসী, আমার মতো ছোটোখাটো চাওয়া নেই তোর, তোর অল্পে সুখম্ নাস্তি, ভূমৈব সুখম্।

অরিজিৎ দাঁড়াল হঠাৎ, হাসল—স্নায়ুবিকারের সেই হাসি, বলল-বলে যা।

—বলছি। জগন্নাথ হাসল না—আমার এই বড় হওয়ার চেষ্টা, বেঁচে থাকার চেষ্টাকে তুই ঘেন্না করিস, তোর অনুকম্পা হয় সংসারী

প্রতিটি মানুষকে। যতবার আসিস ততবার আমাকে টেনে নিয়ে বেড়াস সারা কলকাতায়। কত অচেনা গলিঘুজি তুই আমাকে চিনিয়েছিস, নিয়ে গেছিস কত অচেনা পরিবেশে। সত্যিই তোর মতো করে আমিও দেখিনি এই শহর। এইটুকু জেনে তোর তৃপ্তি যে আমরা এখানে থেকেও নেই, অথচ না থেকেও তুই আছিস।

জগন্নাথ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। ওরা বড় রাস্তায় এসে পড়েছিল। রাত এগারোটায় রাস্তা ফাঁকা। বাস স্টপে এসে দাঁড়াল ওরা। বাস এসে থামল, চলে গেল, অরিজিৎ ফিরেও তাকাল না সে দিকে। জগন্নাথ হাসল—তোর কথা বনলতাকে বলেছি, বন্ধুবান্ধবদের বলেছি, তোকে নিয়ে অহংকার ছিল আমার। তোকে না দেখেও তাই অনেকে তোকে শ্রদ্ধা করে। কেননা তুই কিছুই গ্রহণ করিস না, তুই পৈতৃক সম্পত্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছিস, তুই বয়সের ভার মানলি না, তুই ধার্মিক না হয়েও সন্ন্যাসী। আমিও চোখ বুজলে তোর একটা চেহারা দেখতে পাই—কাঁধে রুক-স্যাক, পায়ে ময়লা হান্টিং বুট, নোংরা জামা-কাপড়, গালে দাড়ি—তুই চলেছিস। শুধু স্ফটিকের মতো পরিষ্কার তোর দুই চোখ—কেননা তোর চোখে কোনো ছোট খাটো কামনা-বাসনার বাস নেই, তোর চোখে পাহাড়, অরণ্য ও সমুদ্রেরা বাস করে। তাই না? আমি সে-কথাই বলে বেড়াই লোককে। কিন্তু একটা জায়গায় সন্দেহ থেকে গিয়েছিল। তুই বার বার ফিরে আসিস আর বার বার ঘুরে ফিরে আমাকে দেখে যাস। কেন?

—কেন? প্রায় হিংস্র গলায় অরিজিৎ প্রশ্ন করে।

—নিজেকে মনে পড়িয়ে দিতে। জগন্নাথ হাসল—যাতে তোকে ভুলে না যাই, যাতে তোর কথা আর কেউ ভুলে না যায়। তুই না থেকেও থাকতে চাস। তুই তোর বাউণ্ডুলে চেহারাটা একবার আমা-দের চোখের সামনে তুলে ধরেই সরে পড়িস, যাতে আমরা নিজেদের জন্য দুঃখিত হয়ে পড়ি। মাথা নাড়ে জগন্নাথ—তোকে বলছি, বাস্তবিক

যতবার তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে ততবার আমি নিজের জন্য দুঃখিত হয়ে পড়েছি। বনলতার কাছে তোর গল্প করতে করতে কতবার ঘৃণ্য মনে হয়েছে নিজেকে! মনে হয়েছে সুখভোগের কণামাত্র অধিকার আমার নেই, তোর আছে—কেননা তুই সব ছেড়েছিস।

অরিজিৎ আস্তে আস্তে বলল —তুই আমাকে ঘেন্না করিস?

জগন্নাথ সে কথার উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে বলল—এই বয়সেও তোর চেহারাটা চমৎকার, শক্তিমানের চেহারা! তোর শরীরে কোনো অসুখ আছে—বিশ্বাস হয় না। তবু তুই আজ দুপুরে ট্রামে ওঠার আগে যখন আমার হাত ধরেছিলি তখন তোর হাত কাঁপছিল। আমি চমকে উঠেছিলাম। সেই মুহূর্তে কেন জানি না আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল তুই বড় পুরোনো হয়ে গেছিস। যখন ময়দানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তোর সঙ্গে, তুই বলছিলি তোর বয়স হয়ে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ মনে হয়েছিল তোর বাউণ্ডুলে স্বভাব আর নেই, এখন তুই কেবল বাউণ্ডুলে সেজে আছিস—তোর দৌড় সাজঘর থেকে স্টেজ পর্যন্ত। তোকে আর 'আইডল' না ভাবলেও চলে। একটু আগে তুই মৃত্যুভয়ের কথা বলছিলি, কথার ছলে এরকম কথা তুই আগেও বলেছিস। কিন্তু আজ আমার মনে হল তোর এই ভয় বড় 'জেনুইন'। জগন্নাথ দুঃখিতচিত্তে মাথা নাড়ল।

অরিজিৎ কথা বলল না। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় তার ব্রোঞ্জ রঙের মুখে শুধু কয়েকটা সর্পিল রেখা ফুটে রইল।

জগন্নাথ বলল—রাগ করিস না।

—না। অরিজিৎ আবেগহীন শব্দ করল।

—তোর আর অধিকার নেই। জগন্নাথ বলল।

—কিসের?

—নিশ্চিন্ত সুখের জীবনের। জগন্নাথ হাসে—আমার ঘরের দিকে, বনলতার দিকে তুই ভিখিরির মতো চেয়েছিলি! কিন্তু আমি জানি তোর ভিতরে এখনো সেই অহংকার রয়ে গেছে। তুই নিজেই

মেরেছিস নিজেকে। জগন্নাথ একটু চুপ করে থাকে—তুই বলছিলি বেরিয়ে পড়বি। সেই ভাল, থেমে গেলে তুই বুড়ো হয়ে যাবি। তুই বরং বেরিয়ে পড়।

—যাব। বড় অন্যমনস্ক দেখাল অরিজিৎকে।

—তোর মৃত্যুভয়, ধ্বংসের ভয় কিন্তু আমার ভিতরে সঞ্চারিত হল না। হাসে জগন্নাথ—আজ তোর হার হল।

হঠাৎ তীব্র গতিতে ঘুরে দাঁড়াল অরিজিৎ—কিন্তু—!

—কি? ঠাণ্ডা গলায় বলে জগন্নাথ।

আস্তে আস্তে আবার স্তিমিত হয় অরিজিৎ, নীচু গলায় বলে—ভালবাসাই আমাদের দুঃখের কারণ, কেননা সব ভালবাসার জিনিষেরই মৃত্যু আছে।

—এত ঘুরে বেড়িয়ে তুই এইটুকু শিখলি? এ তো পুরোনো কথা? আমি জানি। মৃত্যুভয় আমার নেই। আকাশ বাতাস মাটি আমি নিয়েছি অনেক, সেটা শোধ করতে হবে।

ম্লান হাসল অরিজিৎ—তোর মতো কথা বলতে পারি না আমি। একটু শ্বাস ফেলে বলল—তুই ফিরে যা। রাত বাড়ছে।

—আর একটু থাকি। বাস আসুক।

অরিজিৎ লম্বা হাত বাড়িয়ে জগন্নাথের কাঁধ নেড়ে দেয়—না। তুই যা। তুই যতক্ষণ আছিস ততক্ষণ আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আজ তোর জিৎ।

ওর হাত ধরল জগন্নাথ—দুঃখিত অরিজিৎ। খুব দুঃখিত।

মাতালের মত হাসল অরিজিৎ—না। তুই যা, চলে যা, ঘরে যা।

—যাচ্ছি। তুই দাঁড়াবি তো বাসের জন্য?

মাথা নাড়ে অরিজিৎ—ঠিক নেই। হাত তুলে আকাশ দেখায় জগন্নাথকে—দেখ।

—কি?

হাসে অরিজিৎ—একটা মাঠ খুঁজে নেবো হয়ত। আমার জন্য পৃথিবী পড়ে আছে।

—সে হয়না অরজিৎ—

—প্লীজ।

ফিরে আসতে আসতে জগন্নাথ একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছে অরিজিৎ—দু হাত সামনের দিকে বুকের ওপর জড়ো করা, আকাশের দিকে নিবদ্ধ মুখ। দীর্ঘ জীর্ণ শরীর অন্ধকারে নিষ্পত্র গাছের মতো দেখাচ্ছে।
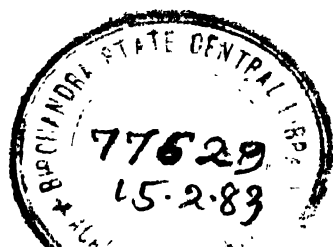
॥ তিন ॥

যদিও অনেকক্ষণ হল সকাল হয়েছে তবু আলস্য বশতঃ বিছানা ছাড়েনি জগন্নাথ। বালিশে কনুই রেখে আধশোয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। পড়তে পড়তেই হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ডাকল —শোনো বনলতা!

দিনের মধ্যে একশবার করে ডাকে জগন্নাথ—খামোখা। বনলতা তখন ট্রাঙ্ক খুলে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে একগাদা জামাকাপড় নামিয়ে আবার গুছিয়ে তুলছে। মুখ না ফিরিয়ে নিস্পৃহ গলায় বলল কি হল?

—দেখনা, এদিকে এসো।

—উঃ, যা বলবার ওখান থেকে বল, কাজ করছি। এই বলে বনলতা জগন্নাথের সদ্য ধোয়া পাঞ্জাবিটা তুলে নিয়ে দেখল তাতে একটাও বোতাম আস্ত রাখেনি অসভ্য ধোপাটা। জগন্নাথের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সে উঠে পুরোনো একটা পাউডারের কৌটো খুলে ছুঁচ সুতো খুঁজতে যাচ্ছিল। একহাতে জগন্নাথের পাটভাঙা পাঞ্জাবিটা ধরা—বোতাম বসাবে।

কাগজে মুখ আড়াল করে জগন্নাথ বলল—ব্যাপারটা কিন্তু সিরিয়াস।

—কি এমন!

একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে জগন্নাথ বলল—সেই ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক যার সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল, এখন মনের দুঃখে তিনি চললেন ইংলণ্ডে। কাগজে ছবি বেরিয়েছে—গোয়িং অ্যাব্রড ফর হায়ার স্টাডিজ।

পাউডারের কৌটোর ভিতর আপনিই থেমে গেল বনলতার আঙুল। কেমন একটু থমকে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গেই হেসে বলল—

মনের দুঃখে যাবে কেন, দুঃখ কিসের। পড়তে যাচ্ছে তো।

—দুঃখ নয়! জগন্নাথ বিচ্ছুর মতো হেসে মুখ ফেরাল—কেবল ভালবাসায় ভুলিয়ে নিলাম তোমাকে! দুঃখ তোমারও হওয়া উচিত। ছবিটা দেখ, খবরের কাগজের ছবি ভাল ছাপা হয় না, তবু বোঝা যায় কী হ্যাণ্ডসাম!

পাউডারের কৌটোয় ছুঁচ খুঁজে পেল না বনলতা। নতুন সংসার—এখনো সব গোছানো হয়নি। কোন জায়গায় কী রেখেছে তা ভুল হয়ে যায়। একটু বিরক্ত হয়ে বলল—বক্ বক্ কোরোনা।

—ছবিটা অন্ততঃ একবার দেখ।

এবার বনলতা হাসল—দেখব, কিন্তু তাতে কি? সুন্দর চেহারা বা ইঞ্জিনীয়ার দেখলেই ঢলে পড়তে হবে নাকি? তা ছাড়া তুমিই কি কিছু কম?

—কম? বিস্ময়ের ভাণ করে জগন্নাথ বলে—কম কেন হবো? আমার বয়স বত্রিশ আর ভদ্রলোকের আঠাশ। বয়সেই তো মেরে দিয়েছে।

—কী যে বাজে বাজে কথা সব, মাথা মুণ্ডু নেই। বনলতা পাউডারের কৌটো ফেলে দিল টেবিলের ওপর। ভ্রু কুঁচকে বলল ওঠো না।

একটু হাসি তখনো লেগেছিল জগন্নাথের মুখে, কাগজটা ফেলে দিয়ে সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। বলল—এত রাগ! এখনই পুরোনো হয়ে যাইনি তো!

—পুরোনোই তো! পুরোনো, বুড়ো, বাজে। রাগ করে হাতের পাঞ্জাবিটা জগন্নাথের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল বনলতা। পাঞ্জাবিটা জগন্নাথের মুখ চোখের ওপর পড়ল। জগন্নাথ হেসে উঠল। পর মুহূর্তেই চেঁচিয়ে বলল—এক কাপ চা দিও, আর দেশলাইটা—

—কাঁচকলা। বনলতার জবাব পাওয়া গেল।

মুখের ওপর থেকে পাঞ্জাবিটা সরায়নি জগন্নাথ, কাপড়ের সাদা

মিহি বুনোটের ভিতর দিয়ে চেয়ে ছিল। সিলিং, দেয়াল, বইয়ের র‍্যাক, টেবিল, বুকের কাছেই হাঁ করে থাকা জানলা এইসব দেখছিল। শরতের সাদা মেঘ জানলা জুড়ে আছে। চকিতে সব কিছু স্বপ্নের মতো মনে হয়—অচেনা, চেয়ে থেকে থেকে আধঘুমে পেল জগন্নাথকে।

এখনো কিছুই গুছিয়ে তোলা হয়নি। ঘরের দিকে তাকালেই বোঝা যায়—অনভ্যস্ত হাতে গুছিয়ে রাখার চেষ্টায় জিনিষ পত্র সব এলোমেলো হয়ে আছে। একটু আগে ট্রাঙ্ক খুলেছিল বনলতা, আধখোলা সেই ট্রাঙ্ক ঘরের মাঝখানেই পড়ে আছে বন্ধ করে যায়নি। প্রায়ই কাজের জিনিষ খুঁজে পায়না বনলতা। রাগ করে। অনভ্যাস জগন্নাথেরও। এত নতুনের মধ্যে তারা এসে পড়েছে হঠাৎ যে হাঁফ ধরে যায়। তবু এরই ভিতরে কোথাও রয়েছে বোকার মতো এক রকমের সুখ যা জগন্নাথ আগে কখনো উপভোগ করেনি। খুব নির্বোধের মতো, বুদ্ধিহীনের মতো এই তৃপ্তিদায়ক সুখ গ্রহণ করতে হয়। অযৌক্তিক। অলস, আধোঘুম চোখে পাঞ্জাবির মিহি বুনোটের ভিতর দিয়ে চেয়ে ছিল জগন্নাথ। চায়ের কাপ হাতে বনলতার ভারসাম্য রক্ষাকারী ছায়া-ছায়া ছবির মতো অবয়ব দেখা গেল দরজার কাছে। চৌকাঠে পা দিয়েই চেঁচিয়ে বলল—এই কি হচ্ছে! মুখ থেকে ওটা সরাও কিম্ভূত কোথাকার!

জগন্নাথ নড়লনা, তেমনিই শুয়ে রইল। সাদা, মিহি বুনোটের মসলিন ঘেরাটোপের ভিতরে সে বনলতার অসম্ভব সুন্দরমুখ দেখছিল। আবছা বলে আরো ত্রুটিহীন সেই মুখ। চায়ের কাপ এক হাতে, অন্য হাতে মস্ত খোঁপাটা সামলাতে সামলাতে কাছে আসছিল বনলতা ডাকছিল—এই, ওগো—

তারপর ধীর হাতে পাঞ্জাবিটা মুখ থেকে তুলে নিয়ে নরম গলায় বলল—অসময়ে ঘুমোবার তাল, না?

জগন্নাথের মুখে তখনো সেই হাসি, যা অর্থহীন সুখের। উঠে বসে

বলল—ভয় পেয়েছিলে ?

—কিসের ভয় ? বলে বিছানার ওপরেই চায়ের কাপ রাখে বনলতা, পর মুহূর্তেই জিব কেটে কাপ তুলে নেয়—কাগজটা পাতো না, কাপটা রাখব।

হাত বাড়িয়ে চা নেয় জগন্নাথ, বলে—রান্নাঘরে কি করছো ?

—কি আবার ! রান্নাঘরে যা করতে হয় তাই। আবার ভ্রু কোঁচকায় বনলতা।

—একটু বোসো না।

—বড় জ্বালাও তুমি ! বলতে বলতে বসল বনলতা, বসতে না বসতেই বালিশে মাথা রেখে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে ঝোলানো পা দোলাতে লাগল। নিশ্চিন্ত গলায় বলল—তোমার না বারোটায় ক্লাস ! এখন এগারোটা বাজে কিন্তু।

—হবে। পত্রিকাটা আবার খুলবার চেষ্টা করে জগন্নাথ।

—ওটা রাখোনা ! বসতে বললে কেন তবে ?

—তুমি তো এক্ষুনি পালাবে রান্নাঘরে।

—ততক্ষণ অন্ততঃ রাখো।

জগন্নাথ কাগজটা ফেলে বড় বড় কয়েকটা চুমুকে গলা পুড়ি চা গিলে ফেলে বনলতার পাশে গড়িয়ে পড়ে।

বনলতা—কী হচ্ছে ?

জগন্নাথ সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করে—বললে না তো ঘরে ঢুকে আমার মুখ ঢাকা দেখে ভয় পেয়েছিলে কি না !

—জানিনা।

—তুমি ভীতু এক নম্বরের। জগন্নাথ হাসে।

—বাঃ, ভয় কিসের ! বনলতা নিস্পৃহ গলায় বলে।

—তবে বলব কিসের ভয় ! মানুষের মুখ কখন ঢেকে দেওয়া হয় জানো ?

ঢেউয়ের মতো বনলতা জগন্নাথের ওপর পড়ল। বালিশ, খবরের

কাগজ, বিছানার চাদর, বনলতা ও জগন্নাথ একসঙ্গে জড়িয়ে পড়ছিল। শ্বাসরোধকারী আলিঙ্গনে জগন্নাথের ঠোঁট থেকে ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে বনলতা আচমকা বলে—তুমিও তো চলে যাবে!

—কোথায়?

—বিলেতে!

—ওঃ! জগন্নাথ হাসল—হয়তো যাব। কে জানে যাবই কিনা!

শিথিল হয়ে এসেছিল জগন্নাথের হাত, বনলতা উঠে বসে খোঁপা ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল। বলল—এবার ওঠো।

—তোলো দেখি টেনে! হেসে হাতদুটো বাড়িয়ে দেয় জগন্নাথ।

হাসে বনলতা—আমি কি পারি?

—চেষ্টা করে দেখ।

—দাঁড়াও। বলে কোমরে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে জগন্নাথের হাত ধরে সে। টেনে তুলতে গিয়ে টের পায় তাকেই বিছানায় টেনে নিচ্ছে জগন্নাথ। হেসে বলে—এরকম কথা ছিল না তো!

—উঠতে ইচ্ছে করছে না। বলে জগন্নাথ হাই তোলে।

—বিছানার পোকা। এ ফ্ল্যাটটা আজ পর্য্যন্ত তুমি বোধ হয় সবটা ঘুরে দেখনি, ছাদে যাওনি।

—না হয় নাই গেলাম।

জগন্নাথের মাথার চুলে কাকের বাসা। বনলতা ওর ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিল, বলল—এ পাড়ায় আমাদের একমাস থাকা হোয়ে গেল, কিন্তু এখানকার একজন লোকও তোমায় চেনেনা।

—আস্তে আস্তে চিনলে সেই চেনা অনেকদিন থাকে। সহজে ভুল পড়ে না।

—কুনো কোথাকার! আজ বাজারটাও করোনি। ঠিকে ঝি একগাদা শাকপাতা কিনে এনে ফেলে গেছে।

জগন্নাথ উঠে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙে। অতিরিক্ত শুয়ে থেকে থেকে শরীরে এক ধরণের জ্বর জ্বর ভাব। আড়মোড়া ভাঙতে

গিয়ে হাড়ের শব্দ ওঠে খট্‌খট্‌। হাই তুললে শরীর আরো শিথিল হয়ে আসে।

—এখন সাড়ে এগারোটা কিন্তু! বনলতা সতর্ক করে বলে—আজ আর হল তোমার কলেজে যাওয়া।

অ্যাঁ! বোকার মতো নির্বোধ চোখে একটু চেয়ে থাকে জগন্নাথ, তার স্বয়ংক্রিয় হাত টেবিলের ওপর থেকে হাতঘড়ি তুলে নেয়। ঘড়ির কাঁটা দুটোর সঠিক সংস্থান বুঝতে একটু সময় লাগে তার। পরমুহূর্তেই ঘড়ি টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বলে—ইচ্ছেও করছিলনা যেতে। আজ একটা মোটে ক্লাস।

—বসে থেকে থেকে তোমার ভুঁড়ি বেড়ে যাচ্ছে।

—কলেজে যাবনা বলে তুমি খুশী হলেনা বনলতা?

—বিয়ের পর আর কদিন কলেজ করেছো তুমি! কেবল কামাই, দেবে চাকরি থেকে নট্‌ করে। বলতে বলতে বনলতা উড়ে গেল লঘুপায়ে, চড়াই পাখীর মতো। জগন্নাথ একা দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ, কোনোই কাজ নেই হাতে। র‍্যাকে আগোছালো বই পড়ে আছে, অনেকদিন হাত দেওয়া হয়নি। পাতলা ধূলোর সাদা আস্তরণ পড়েছে। বইয়ের থাকের পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে তার ছাতার বাঁকানো বাঁট ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে সযত্নে ঢাকা আছে শেলাইয়ের মেশিন। বনলতার আগোছালো স্বভাব। চারদিকটা দেখে সে ভ্রু কুঁচকে রইল। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল—এই, শুনে যাও।

কোনো সাড়া পাওয়া গেলনা।

সকালে দাঁত মাজেনি মুখ বিস্বাদ হয়ে আছে। স্নান না করলে জ্বরভাব কাটবে না। বাথরুমে যাওয়ার সময়ে দেখল বইয়ের র‍্যাকের পিছনে নেম প্লেটটা পড়ে আছে। এসপ্ল্যানেড থেকে সস্তায় কালোর ওপর সাদা প্ল্যাস্টিকের অক্ষর লাগিয়ে তৈরী করা নেমপ্লেটটা কিনেছিল—লাগানো হয়নি। সেটা তুলে একটু দেখে নিয়ে আবার যেখানে ছিল সেখানেই ফেলে রেখে দিল। থাক্‌গে। বারান্দায় এসে

একটু দাঁড়ায় জগন্নাথ। একতলার বারান্দা, তারপর একফালি ঘাসজমি, তারপরই চওড়া ফুটপাথ, বড় রাস্তা। এদিকটা নতুন হয়েছে। পাড়াটা খুব ছিমছাম, লোকজন বড় একটা দেখা যায় না, মাঝে মাঝে হুশ্ করে মোটর গাড়ি চলে যায়।

আবার ঘরের মধ্যে ফিরে আসে জগন্নাথ। কী করবে ভেবে পায় না। কলেজে গেলনা, অঢেল সময় হাতে। রান্নাঘরে বনলতা আছে, সেদিকে পা বাড়িয়েও আবার ফিরে এল। এখনো অনভ্যাস রয়ে গেছে, বারবার বনলতার কাছে যেতে লজ্জা করে, কয়েকদিন আগেও বনলতার সামনে হুট্ করে গায়ের গেঞ্জীটা খুলতে তার বাধো বাধো ঠেকতো।

নেমপ্লেটটা তুলে জগন্নাথ প্লাস্টিকের ওপর লেখাটুকু পড়ে—প্রফেসর জে, বোস, এম-এ-ডি ফিল। একই সঙ্গে একধরনের গ্লানি ও অহঙ্কার অনুভব করে সে। বইগুলোর ওপর অন্যমনস্কভাবে কয়েকটি আঙুল রাখে। কিছুই করবার নেই আর। এক এক সময়ে নিজেকে তৃপ্ত এবং কামনা বাসনা রহিত বলে মনে হয়। অথচ ঠিক তা নয়—সে জানে। একটু কুঁজো হয়ে সে নিজের পেটটা টিপে দেখে। একটু চর্বি বোধ হয় বসেছে ঠিকই। ভাবল, এখন তার খুব কাজ করা দরকার। খুব ব্যস্ত থাকা দরকার। নইলে শরীরে মেদ নামবে। ক্রমশঃ উচ্চাশাগুলি হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে।

কলঘরে জল পড়ে ভেসে যাওয়ার শব্দ আসছে। রান্নাঘরের দিকে কোনো শব্দ নেই। কে জানে কোথায় গেল বনলতা! একটু অন্যমনস্ক জগন্নাথ নেমপ্লেটটা হাতে নিয়ে ঘরে ঘুরে ঘুরে পেরেক খুঁজতে লাগল। তবলা ঠোকার একটি ছোটো হাতুড়ি পাওয়া গেল পুরোনো খবরের কাগজের স্তূপের নীচে, বনলতার জিনিষপত্রের সঙ্গে কি করে এসে গেছে, পেরেক পাওয়া গেলনা। খুঁজতে খুঁজতে রান্নাঘরে আসে জগন্নাথ। বনলতা নেই, উনুনের ওপর এক হাঁড়ি জল চাপানো আছে—কে জানে কোন কাজে বা অকাজে লাগবে!

ভরসা ছিল না, তবু রান্নাঘরের ময়লা তাকে কয়েকটা জংধরা পেরেক পেয়ে গেল জগন্নাথ। ছোটো হাতুড়িটা সেই তাকে ফেলে রেখে শিল-নোড়ার নোড়াটা তুলে নিয়ে সদরে আসে জগন্নাথ। পেরেক ঠুকে ঠুকে নেমপ্লেটটা লাগাতে থাকে দরজায়, কলঘরে জলের শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। বনলতার ক্ষীণ গলা ভেসে আসে—এই, কী হচ্ছে! বাড়িঘর ভেঙে ফেলছ নাকি?

—তুমি কোথায় লুকিয়ে আছো?

—আমার জায়গা আছে, বলব কেন?

হাসে জগন্নাথ—তবে কলঘরে কে?

একটু চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে ভিন্ন জায়গা থেকে বনলতার গলা আসে—কলঘরে খুঁজে দেখনা কে! কিন্তু কী হচ্ছে শুনি!

—এসে দেখে যাও।

—আমার বয়ে গেছে। বাড়িওয়ালা শব্দ শুনছে ঠিক, সেই আসবে দেখতে।

কাজ হয়ে গেলে জগন্নাথ দরজায় নিজের নামের ফলকের দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। হঠাৎ সম্পূর্ণ অচেনা মনে হয় প্রফেসর জে, বোস, এম-এ-ডি-ফিলকে।

ঘরে এসে নোড়াটা টেবিলের ওপর রাখতে যাচ্ছিল, তখন ভিতরে দরজা দিয়ে বনলতা ঘরে ঢোকে। ভেজা শরীর, পরণের শাড়ি খানিকটা কোমরে জড়ানো, বাদবাকীটা কাঁধের ওপর জড়ো করা, ভাল করে পড়েনি এখনো। শায়ার লেস বেরিয়ে আছে, চুলে জড়ানো গামছা নিংড়ে জল ফেলতে ফেলতে ঘরে ঢুকল। সাবানের স্নিগ্ধ গন্ধের সঙ্গে জলেভেজা শরীরের গন্ধ, ঘরটা ভরে যায়। শ্বাস টেনে জগন্নাথ বলে—ইস্ বনলতা খুব জল ঢেলেছো, তোমার ঠোঁট ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

—আমার ঠোঁট নিয়ে ভাবতে হবে না। হোকগে ফ্যাকাসে। বলে পরমুহূর্তেই জগন্নাথের হাতের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলে—ইস্,

আমার নোড়া! ওটা তুমি কোত্থেকে পেলে?

—যেখানে ছিল, রান্নাঘরে।

—তোমাকে নিয়ে পারি না, কী হচ্ছিল ওটা নিয়ে শুনি!

—বলছিলে পাড়ার লোকে চেনে না আমাকে, তাই নেমপ্লেটটা লাগিয়ে ছিলাম, এবারে চিনবে।

—ছাই চিনবে। বনলতা হাত বাড়িয়ে বলল—নোড়াটা দাও তো! পেরেকে ঠোকে কেউ ওটা দিয়ে? ইস্, যদি ভেঙে যেত।

জগন্নাথ দেখে বনলতাকে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে, রগড়ে রগড়ে গা মুছেছে বোধহয়--- এখনো গাল, কানের লতি, চিবুক আর নাকের ডগা লাল হয়ে আছে, অবশ্য লালটা নতুন গামছার কাঁচা রঙটাও হতে পারে। ভেজা চুল মাথায় বসে যাওয়ায় ওর নিখুঁত গোল মাথার আকার বোঝা যায়। বনলতার সৌন্দর্য প্রায় ত্রুটিহীন।

নোড়াটা বাড়িয়ে জগন্নাথ বলে—নিয়ে যাও তোমার মূল্যবান নোড়া।

হাত বাড়িয়েও জগন্নাথের চোখে চোখ রেখে পিছিয়ে যায় বনলতা—না বাবা, কাছে গেলেই হুট্ করে একটা অসভ্যতা করে বসবে।

ভীষণ শব্দ করে নোরাটা মেঝের ওপর পড়ল. চকিতে ঝুঁকে লাফ দিয়ে এগোলো জগন্নাথ কিন্তু ধরা পেল না। অসম্ভব দ্রুত লঘু পায়ে চরকির মতো বোঁ করে ঘুরে ঘরে গেল বনলতা। চেচিয়ে বলল—

—ছুঁয়োনা আমাকে 'তুমি এখনো চান করোনি।

বাতাসে শূন্যতা আঁকড়ে জগন্নাথ ফিরে বলে তাতে কি?

—ছুঁতে নেই, এখন আমি ঠাকুরকে জল দেবো। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে চুল থেকে লতানো গামছা আস্তে আস্তে খুলল বনলতা, নিস্পৃহ গলায় বলল—এত হৈ-চৈ করো তুমি আশে পাশের লোক টের পেয়ে যাবে।

—তোমার ভিতরে এখনো হাজারটা গোলমাল রয়ে গেছে।

—কিসের গোলমাল ?

—নানা রকমের। ছোঁয়া-ছুঁয়ি ফ্রী-নেসের অভাব, লোকভয়—এই সব আর কি !

—আহা, থাকবে না কেন ?

জগন্নাথ বালিশের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে দেশলাই খুঁজতে খুঁজতে বলে—তোমার তো ভাত মেরে দিয়েছি বামুনের মেয়ে।

বনলতা ম্লান একটু হাসল—খুব ক্রেডিট, না ?

—নয় ? ভ্রু তুলে কপালে ভাঁজ ফেলে জগন্নাথ।

—ছাই। আমি রাজি না হলে তোমার সাধ্যি ছিল ?

ঠোঁটে সিগারেট লাগিয়ে অসহায়ভাবে জগন্নাথ বলে—দেশলাইটা ?

লঘু পায়ে কাছে এসে ঠোঁট থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় বনলতা, পরমুহূর্তেই তার ভেজা ঠোঁট জগন্নাথের ঠোঁটের সঙ্গে লিপ্ত হয়। দুটি ভেজা ঠাণ্ডা হাত জড়িয়ে ধরে জগন্নাথের গলা।

যেমন ধরেছিল, তেমনি হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে দ্রুত শ্বাসের সঙ্গে বনলতা বলে—হয়েছে তো ! এবার যাও চান করতে।

॥ চার ॥

নেয়ে খেয়ে দুপুরবেলা আবার বিছানা নিয়েছে জগন্নাথ। খাওয়ার পর রান্নাঘর ধুয়েছে বনলতা। আরো দু'একটা কাজ সেরেছে ঘুরঘুর করে। তারপর এসে মেঝেতে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসেছে এখন—সামনে খোলা খবরের কাগজ। ঝুঁকে কি পড়ছিল, মুখ না তুলেই প্রশ্ন করে—এই, তুমি কখনো 'মাশরুম' খেয়েছ? হোটেলের বিজ্ঞাপনে রয়েছে।

জগন্নাথ কাৎ হয়ে শুয়ে ওর ঘন চুলের ভিতরে সাদা সিঁথি দেখছিল, মস্ত এলোখোঁপা ভেঙে পড়েছে সাদা ঘাড়ের ওপর। অন্যমনস্কভাবে বলে—কী সেটা?

—জানো না?

—উঁহু।

—তবে কিসের বিদ্বান তুমি?

জগন্নাথের ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু ঘুমোতে পারছিল না। অলস ঘুম চোখে বনলতার দিকে চেয়ে থেকে তার সময় কেটে যাচ্ছিল। বড় বেশী সুন্দর বনলতা। এত সুন্দর যে মাঝে মাঝে একধরনের অস্বস্তি হয় জগন্নাথের। ছিপের মতো তেজী লঘু শরীর, অথচ হাত ছোঁয়ালে মনে হয় অল্প উত্তাপেই গলে যাবে। বনলতার মুখশ্রী এক এক সময়ে এক এক রকম। মুখোমুখী এবং পাশ থেকে দেখলে তাকে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয় জগন্নাথের। যেদিক থেকেই দেখা যাক বনলতার মুখ একই রকম আকর্ষণ করে।

—বললে না! বনলতা মুখ তুলে তাকায়। এক পলকেই সে জগন্নাথের চোখ বুঝে ফেলে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয়। প্রায় ফিস্-ফিস্ করে বলে—থন্নাগজ কোথাকার!

বিস্মিত জগন্নাথ প্রশ্ন করে—মানে!

—ও একটা গালাগাল। মুখ নীচু করে হাসে বনলতা।

—কি রকম গাল! কখনো শুনিনি তো!

মুখে আঁচল চেঁপে মেঝের ওপর খামোখা গড়িয়ে পড়ে বনলতা, বলে তোমার নামটা উল্টে বললুম, সোজা নামটা তো মুখে আনতে নেই!

—অ্যাঁ!

বনলতা হাসতেই থাকে—যা বিচ্ছিরি নাম! মুখে আনতে হলে মরে যেতুম।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে একটু হেসে জগন্নাথ বলে—কৌশিক ব্যানার্জি নামটা কেমন?

হাসি থামল বনলতার। হাতের ওপর মাথা রেখে সে মেঝের ওপর কাত হল, বলল—মন্দ কি! তোমার চেয়ে ভাল।

—শুধু নাম! আর চেহারাটা? ছবিটা দেখনি, সিক্স্থ্ পেজ্-এ রয়েছে।

—দেখেছি। ভালই তো।

হতাশ ভঙ্গীতে হাত ওল্টাল জগন্নাথ—কী কল-কৌশল ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের। অতদূর থেকেও এখানকার একজনের হৃদয়ের কলকব্জা নেড়ে দিচ্ছেন।

বনলতা উত্তর দিল না। চোখ বুজে এলিয়ে থাকল। মুখে মৃদু একটু হাসি—সুখ ও তৃপ্তির ভাকটিকিটের মতো লেগে আছে।

জগন্নাথ চিৎ হয়ে শুয়ে সাদা সিলিং দেখল। দেখল, বাইরের শরতের গভীর নীল আকাশ, বহুদূর বিস্তৃত রয়েছে জগৎ ও নক্ষত্র-মণ্ডলী। তাদের দুজনের সঙ্গে যোগসূত্র ও পারম্পর্যহীন যা কিছু আছে তার আর আপাতত কোনো অর্থ নেই জগন্নাথের কাছে। অস্ফুটভাবে কাকে যেন ধন্যবাদ দিল। কেন না এক গভীর স্বপ্নময় সুখবোধ তাকে আচ্ছন্ন করছিল। সে চোখ বুজে থাকল।

আস্তে আস্তে কড়া নাড়ার শব্দ হচ্ছিল। আচ্ছন্নতার ভিতরে থেকে প্রথমটায় খেয়াল করেনি। আবার শব্দ হতেই ঘাড় তুলে জগন্নাথ দেখল, বনলতা ঘুম ভেঙে চেয়ে আছে। অসময়ে কে আসবে! মাথাটা বালিশে আবার ফেলে দিয়ে জগন্নাথ বলল, দেখ তো কে এলো!

দরজা খুলে বনলতা দেখে দরজা ঘিরে চার পাঁচজন অল্পবয়সী ছেলে, কুড়ি-বাইশ বছরের। প্রথম যার ওপর চোখ পড়ল সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল— বনলতা দরজা খোলার পর সে ধীরে সুস্থে চোখ থেকে গগল্‌স্‌ নামাল। চেহারাটা কর্কশ, মুখে বখাটে একটু হাসি। খুব অল্প সময়েই বনলতা টের পেল ছেলেটার তাকানোর ভঙ্গীটা ভাল নয়। প্রায় ভ্রুকুঁচকেই বনলতা জিজ্ঞেস করল—কাকে চাই?

—ডক্টর বোস বাড়িতে আছেন?

বনলতা সরতে পারলে বাঁচে, মাথা নেড়ে বলল—দাঁড়ান, ডেকে দিচ্ছি।

ততক্ষণে উঠে পড়েছে জগন্নাথ। কোমরে ধুতীটা ঠিকমতো জড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল—কি ব্যাপার?

সেই ছেলেটিই একটু হেসে বলল—আপনার কাছেই এসেছিলাম স্যার।

জগন্নাথের মনে পড়ল না এরা তার ছাত্র কিনা, বস্তুত ছাত্রদের মুখ খেয়াল থাকে না তার। জিজ্ঞেস করল—তোমরা আমার ছাত্র?

—না স্যার, আমরা কারুরই ছাত্র নই। ছেলেটা খুব উত্তাপহীন গলায় বলল। সঙ্গে সঙ্গে একটু চাপা হাসির শব্দ হয় তার দল থেকে।

একটু থমকে গিয়েই আবার সামলে নেয় জগন্নাথ, হাসিমুখে বলে—ও ভুল হয়েছিল, কি চাই, ভাই, আপনাদের?

—আপনার চাঁদাটা স্যার—হিপ পকেট থেকে বিল বই বের

করতে করতে বলল ছেলেটা—পাড়ার পূজো।

—ওঃ, একধরনের স্বস্তি পেল জগন্নাথ, কেন তা বুঝল না, বলল, এক মিনিট দাঁড়ান, দিচ্ছি।

ঘরে এসে ব্র্যাকেটে ঝোলানো পাঞ্জাবির পকেটে সে দেখে, বনলতা চুল আঁচড়াচ্ছে। জগন্নাথের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলে কি চায়?

—চাঁদা।

—কি অভদ্র চোখ দেখেছ! বনলতা বিরক্তির সঙ্গে বলল দাঁতে ফিতে কামড়ে।

—আস্তে! জগন্নাথ সতর্ক করে দিয়ে হাসল, বলে—ওদের দোষ দেওয়া যায় না, যা রূপ!

দু'টাকার নোটটা নিয়ে আবার দরজার কাছে এসে দেখে ছেলেটা মুখ নীচু করে রসিদ লিখছে। লেখা হলে রসিদটা হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটা। জগন্নাথ রসিদটা আর দেখল না; কারণ ভয় হল দেখলে বিচ্ছিরি রকমের ভুল বানান চোখে পড়তে পারে।

ছেলেটা কিন্তু টাকা নিতে হাত বাড়িয়েই হাত টেনে নিল, ভ্রু কুঁচকে বলল—এ কী! দুটাকা!

কথার ধরণটা ভাল লাগলনা জগন্নাথের। স্পষ্ট বিরক্তির ভাব। তবু হাসিটুকু লেগেই ছিল জগন্নাথের মুখে, সে বলল—কেন, এই তো যথেষ্ট!

—যথেষ্ট! ছেলেটা অল্পক্ষণ স্থির চোখে জগন্নাথকে দেখে নিয়ে বলল—রসিদটা দেখুন, আপনার নামে দশটাকা লেখা হয়েছে।

—দশটাকা! জগন্নাথ একটু চোখ বড় করে বলে—কেন?

—ওরকমই সকলে দেয় এখানে। শান্ত জবাব পাওয়া গেল।

পেছনে যারা ছিল তাদের মধ্যে একজন, যার রং ফর্সা এবং মুখশ্রী শান্ত, সে একটু হেসে বলল—আপনারা যদি একটু বেশী না দেন তাহলে—

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই সামনের ছেলেটা ফিরে তার দিকে একটু তাকাল। কর্তৃত্বের ভঙ্গী। ছেলেটা চুপ করে গেল। সামনের ছেলেটির মুরুব্বিয়ানা যেন বড্ড বেশী। এতটা ভাল নয়। জগন্নাথের ভিতরে একটা ছোট্ট রাগ তৈরী হচ্ছিল। তবু শান্ত ভদ্র গলায় সে বলল—আমাকে কতটুকু জানেন আপনারা? দুটাকার বেশী দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাও থাকতে পারে!

অন্য কেউ কোনো কথা বলল না, সামনের ছেলেটিই আবার শান্তভাবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রায় চুপ গলায় বলে—চাঁদার রেট আমরা ঠিক করিনা। সকলের সুবিধের জন্য পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক সেটা ঠিক করে দেন। আপনি এ পাড়ায় নতুন, হয়ত নিয়মটা জানেন না।

কথাগুলোর মধ্যে অযৌক্তিকতা কিছু ছিলনা, কিন্তু ছেলেটি প্রায় অপমানসূচক হেলাফেলার ভঙ্গিতে বলল। জগন্নাথ যদিও এদের বয়সী ছেলেদের পড়ায়, তবু অমন কর্কশ চেহারার ছেলে কদাচিৎ দেখেছে। ক্রমশ রেগে গেলে তার মুখ থেকে হাসিটা লুপ্ত হয়েছিল, এবার একটু রাগের সঙ্গেই বলল—পাড়ার কাউকে আমি চিনিনা। তা ছাড়া আমি কত চাঁদা দেবো তা তারা ঠিক করবেন কেন?

—ঠিক আছে। ছেলেটা রাগওঠা, কাঠো একটা লম্বা হাত জগন্নাথের দিকে বাড়িয়ে, তেমনি শান্ত কিন্তু অন্তর্নিহিত রূঢ়তার সঙ্গে বলে—রসিদটা ফেরৎ দিন।

জগন্নাথ দ্রুত চিন্তা করছিল। প্রকৃতপক্ষে বিরোধীতা করার কোনো ইচ্ছেই তার ছিলনা। সে হয়ত টাকাটা দিয়েই দিত। কিন্তু ছেলেটা এইমাত্র যা বলল তা ইচ্ছাকৃত অপমান! বিশেষতঃ সে স্পষ্টই টের পাচ্ছিল যে বনলতা ঠিক তার পেছনে দরজার আড়ালটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। সে মৃদু পাউডারের গন্ধ পাচ্ছিল। বনলতার সামনেই ঘটনাটা ঘটছে। সে তাই স্পষ্ট রাগের গলায় বলল—বেশ, এই নিন। বলে রসিদটা ছুঁড়ে দিল সামনে। হাওয়ায় কাগজের

টুকরোটা উড়ে যাচ্ছিল।

ছেলেটা উড়ন্ত কাগজটাকে ধরে পলকে মুঠোয় দলা করে ফেলে সেটা জগন্নাথের পায়ের কাছে আক্রোশে ছুঁড়ে ফেলে চেয়ে বলল—আর উই বেগার্স ?

সেই ফেটে পড়া চিৎকারটা জগন্নাথকে জোর ধাক্কা দিল একটা। ছেলেটার গলায়, মুখে ও হাতে জোঁকের মতো ফুলে উঠেছে শিরা উপশিরা। তার বন্ধুরা তার কাঁধে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে কি বলে তাকে সামলানোর চেষ্টা করছিল। কোনো কথাই জগন্নাথের কানে গেলনা। সে বুঝতেই পারলনা ওর এত রাগ কেন। ভিতরের যাবতীয় তীব্রতা চোখে এনে ছেলেটা তার দিকেই তখনো চেয়ে ছিল, দাঁতে দাঁত চেপে বলল—বলুন এম, এ, ডি-ফিল, আমরা ভিক্ষে চাইতে এসেছিলাম ?

যা আগে কখনো হয়নি জগন্নাথের আজ তাই হচ্ছিল। সম্ভবতঃ দমকা একটা রাগ ঘূর্ণী ঝড়ের মতো উঠে আসছে শরীরের গভীর থেকে। সে প্রাণপণে বুদ্ধি স্থির রাখার চেষ্টা করেও বলল—ইতরের মতো চেঁচাবেন না। যা বলছেন তা চেঁচিয়ে বলার মতো কথা নয়। ইডিয়েট।

দু একটা দরজা জানালা আশে পাশে খুলে যাচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে পায়ের শব্দ। ছেলেটাকে তখনো তার বন্ধুরা সামলানোর চেষ্টা করছে, তেমনি জেদী কুকুরের মতো দাঁড়িয়ে এক হাতে দরজার ওপর জোর চাপড় মেরে ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল—ইডিয়েট ! আপনি এ পাড়ার লোকদের চেনেননা, কিন্তু এ পাড়ায় আপনার চেয়ে ভদ্র লোকজন কিছু কম নেই এম, এ, ডি-ল। তাদের চিনে নেবেন।

—তুমি তো ভদ্রলোক নও। চাপা গলায় হিংস্র জগন্নাথ বলে।

ছেলেটা পলকে সামনে ঝুঁকে বলে—কী বললেন ? তার মুখে লাল হয়ে ছিল কদর্য বাঁকা ঠোঁট, সমস্ত শরীরে সাপের মতো হিলহিলে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সে আবার বলল—কী বললেন ?

বনলতার নরম হাত সেই মুহূর্তেই জগন্নাথের কনুই চেপে ধরল—এই, কী হচ্ছে ? চলে এসো।

সেই স্পর্শে সমস্ত শরীর দাউ দাউ করে উঠল হঠাৎ। বুকের ভিতরে সুপ্ত এক দামামা বেজে উঠল। সে আঙুল ছেলেটার বুকের দিকে তুলে চিৎকার করে বলল—তুমি তো ভদ্রলোক নও, স্কাউণ্ড্রেল, তুমি তো ভদ্রলোক নও।

ছেলেটা পিচ্ছিল গতিতে এগিয়ে আসছিল, পেশাদারদের মতোই সহজ শীতল ভঙ্গিতে, জগন্নাথ মার ঠেকানোর জন্য হাতও তুলেছিল। কিন্তু বন্ধুরা ঠিক সময়ে ধরে ফেলল ছেলেটাকে। পেটে বুকে কয়েকটা হাত বাড়িয়ে ধরে ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সে মুখ ফিরিয়ে জগন্নাথকে বলল—জুতিয়ে তোমার মুখ ভেঙে দেবো। আজকের ব্যাপারটা মনে রেখো।

জগন্নাথ একটা লাফ্ দিয়ে এগোলো। ধরবে ছেলেটাকে। ছেড়ে দেবেনা। লোক জমে গিয়েছিল বাইরে, বারান্দার নীচে, ফুটপাথেও। সকলের চোখের সামনেই দৌড়ে বেরিয়ে এসে পথ আটকাল বনলতা—ভিতরে চল।

—সরে যাও। জগন্নাথ চেঁচায়।

—ভিতরে চলো তো আগে। শান্ত গলায় বনলতা বলে। তার দুচোখে চিক্ চিক্ করছে জল। কান্নাটা গলার কাছে ফুলে ফুলে উঠছে। আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল বনলতাকে, বাইরের সবাই দেখল, জগন্নাথ দেখলনা। দু হাতে হঠাৎ তীব্র আক্রোশে, সঙ্গমে বাধাপ্রাপ্ত সাপের মতো হিংস্রতায়, আত্মবিস্মৃতিতে বনলতার চুল টেনে ধরে সে বলল—ইউ বীচ্! পরমুহূর্তেই ছেড়ে দিল।

বনলতা তবু সরে গেলনা। দরজার ভিতরে ঠেলে আনল জগন্নাথকে। দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিয়ে বলল—ওদের সঙ্গে তুমি কি পারো ?

দুহাতে মুখ খামচে বিছানায় বসে পড়ল জগন্নাথ। কিছুই

করবার নেই তার। বাস্তবিক কিছুই করবার নেই। তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল, যেন জ্বর আসছে ভয়ঙ্কর। বোধ ও চিন্তার শক্তি ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। উষ্ণ রক্তস্রোত ছলাৎ ছল্ করে আছড়ে পড়ছে মাথায়, চোখে, কানে, বুকে, সে অসুস্থ বোধ করে। শ্বাসকষ্ট টের পায়।

বনলতা নিঃশব্দে ভিতরের দরজা দিয়ে ঘর ছেড়ে গেল—বোধ হয় রান্নাঘরে। কেউ কোনো কথা বললনা।

চুপ করে বসে ছিল জগন্নাথ, কিন্তু গভীর জ্বর বিকারের মতো তার মাথার ভিতরে এলোমেলো কথা আসছিল। অসহায়ের মতো সে টের পেল, তার ঠোঁট নড়ছে, কিছু একটা বলছে সে, কিন্তু কী বলছে তা তার নিজের কাছেও অস্পষ্ট। অশ্লীল গালাগাল, সাজ্ঘাতিক অপমানের কথা, কিংবা ঐরকম কিছু হাত মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছে আপনা থেকেই। আর শরীর জুড়ে অবসাদ।

বনলতা অনেকক্ষণ এ ঘরে এল না।

ক্রমশ: জগন্নাথ অনুভব করছিল শরীরের ভাঁটার টানের মতো একটা টান, রক্তের অস্বাভাবিক উত্তাপ নেমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। অবসাদ ভেঙ্গে আনছে তাকে। বোজা চোখ খুলে সে ঘরের দিকে তাকাল। অচেনা ঘর। শরতের বেলা শেষ হয়ে ঘরে পাতলা অন্ধকার জমেছে, অথচ আলো জ্বালেনি কেউ। এই ভাল। অন্ধকারে জগন্নাথ চেয়ে রইল—ঘরের সব আসবাব জীবনধারনের সব উপকরণকেই হঠাৎ অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। সে এতকাল কতগুলো স্বভাবকে পুষেছে—সে ঘরকুনো, অতিরিক্ত প্রেমিক, বাইরের জগৎ সম্পর্কে উদাসীন, ঘর তার বরাবর প্রিয়, বাইরেটা অচেনা রেখে সে তৃপ্তই ছিল, কিন্তু ভুল হয়ে গেছে। বৃথাই জীবনধারণ করেছে এতকাল জগন্নাথ। সে বিষাদ বোধ করে মাথা নাড়ল। সে বুঝতে পারছে শুধু প্রাণধারণ করে থাকার মধ্যে, শুধু সুখে থাকার মধ্যে কিছু নেই। সুখের ঘর বারংবার আক্রান্ত হয়। এই ঘর সংসারের প্রতি তার

একটা অনিচ্ছা জেগে উঠতে থাকে। সে কেন আর বনলতার চুম্বন গ্রহণ করবে! সর্বাঙ্গ রি রি করেওঠে ঘৃণায়, গার্হস্থ্য ও সহবাস অকস্মাৎ অশুচি বলে মনে হয়। সমস্ত ঘরখানা, এই সংসার যেন বনলতার গলায় নিঃশব্দ এক চিৎকারে বলতে থাকে—ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা আমাকে। তুমি এখনো চান করোনি।

ভীষণ অস্থিরতা বোধ করে সে। উঠে দাঁড়িয়ে একটু পায়চারি করতে গিয়ে তার অনিচ্ছার সঙ্গে বসে পড়ে আবার। এই ঘর, গত মাসখানেক এই ঘরে বসবাসকালের মধ্যে কত তুচ্ছ ঘটনা ঘটেছে, যেগুলির এক একটা সুন্দর অর্থ ছিল তার কাছে। মনে পড়ল কিছুদিন আগেও এই ঘরে তার শিক্ষিত ও বিজ্ঞ বন্ধুদের সমাবেশ ঘটেছিল, যারা সুন্দর কথা সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারে। তারা বনলতার প্রশংসা করেছিল, জগন্নাথের। তারা ফ্ল্যাটটার প্রশংসা করে ছিল, পাড়াটারও। এই ঘরে এসে গেছে বাউণ্ডুলে অরিজিৎ, যাকে অপমান করেই প্রায় বিদায় দিয়েছে জগন্নাথ।

চিন্তা করলে এতকাল কেবল সহৃদয় এবং সুন্দর পরিবেশেই খুঁজে এসেছে জগন্নাথ। সহৃদয় বন্ধু, বাড়িওলা, ট্রামেবাসে সহৃদয় কণ্ডাক্টর, বাজারে সহৃদয় বিক্রেতা, কলেজে সহৃদয় ছাত্র ও সহকর্মী। সুন্দরী স্ত্রী, ছিমছাম্ বড়লোকদের পাড়ায় সুন্দর ফ্ল্যাট—এতকাল এসবই কি চায়নি জগন্নাথ! কে না চায়? কিন্তু এখন তীব্র ও রহস্যময় এক অনিচ্ছার ভিতর দিয়ে সে অনুভব করে যে, এই সবকিছু তার কছে প্রয়োজন শূন্য হয়ে গেছে হঠাৎ। সে জানে এবং বোঝে আজকের বিকেলের এই ঘটনাটুকুও তার আয়ুষ্কালের তুলনায় অতি তুচ্ছ। একদিন সব কিছু ভুল পড়ে যাবে। তবু এর মধ্যেই কোথাও আবহমানকালের সত্যের চেহারা তার কাছে ধরা পড়ছিল।

অনেকক্ষণ আচ্ছন্নতার ভিতরে রইল সে। এক একবার চোখ বুজেই টের পেল বনলতা ঘরে এল, টুকটাক করে কী যেন করল, আবার চলে গেল। লজ্জায় চোখ খুললনা জগন্নাথ! শুধু বনলতার

শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়া প্রসাধনের সৌরভ তার কাছে অস্বস্তিকর লাগছিল।

অবশেষে রাত্রিবেলা বনলতা খেতে ডাকলে কিছুক্ষণের জন্য বাস্তবতার মধ্যে ফিরে আসে সে। নিঃশব্দে খেতে বসল। খেল সামান্যই এবং বনলতার সেজন্য অনুযোগও করলনা। হয়তো তার প্রতি একধরণের সাময়িক ঘৃণা এসেছে বনলতারও। ভেবে ভারী খুশী হল জগন্নাথ। বনলতার ঘৃণা যে এত উপাদেয় হতে পারে তা কখনো কল্পনা করেনি সে।

রাত্রি গভীর হলে বনলতার অসহনীয় নৈকট্যে শুয়েছিল জগন্নাথ। চোখ বুজে সে ঘোর-ঘোর দৃষ্টিতে দেখছিল ভীষণ অ্যাভালেন্স নামছে, দুরন্ত তুষার ঝড় দুর্নিরীক্ষ পাহাড়ের চূড়া—তবু কারা যেন চলেছে। নীচে নিরাপদ পৃথিবী, গৃহ ও প্রিয়জনের সঙ্গে যোগসূত্রহীন তাদের যাত্রা। সে দেখল প্রচণ্ড ঝড়ে সমুদ্রে চলেছে নৌকা, অর্ধনগ্ন কয়েকজন মানুষ মরণপণ চেপে ধরে আছে হাল, কূলকিনারাহীন সমুদ্রে শেষ দেখবে তারা। পৃথিবী জুড়ে চলেছে মানুষের লড়াই, সেইসব লড়িয়ে মানুষদের কর্কশ কণ্ঠস্বর তার ঘুমের মধ্যে ভেসে আসছে। তারা তার নেমপ্লেটে থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছে, তার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করে পরস্পর হাসছে, তারা তার মেদবহুল চেহারার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে 'দুয়ো', গভীর ডিলিরিয়ামের ভিতরে থেকে নিজের উন্মত্ত রক্তস্রোতের ভিতর সে উচ্চারিত হতে শুনল—যেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত।

বনলতার একটা হাত কোমলভাবে তার বুকের ওপর এসে রইল কী বলছ, এই! প্রশ্ন করে বনলতা।

আবার তীব্র অনিচ্ছা বোধ করে জগন্নাথ, বনলতার হাত সরিয়ে দিতেও তার প্রবৃত্তি হয় না।

বনলতা আস্তে বলল দেখ, আজকের ঘটনাটা তো এখানেই

শেষ হল না। ছেলেগুলো ভাল নয়, তার চেয়ে চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

কিছুই উত্তর দিল না জগন্নাথ। সে নিজের গলার অস্পষ্টস্বর শুনতে পেল—যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যদ্ধু কামানবস্থিতাম। পর-মুহূর্তেই সে সজাগ হয়ে উঠে চোখে হাত চাপা দিল। কোথাও আলো ছিল না, শুধু বুকের কাছে হাঁ করে থাকা জানালা দিয়ে মশারির বাধা ভেদ করে আসছে আবহমানকালের নক্ষত্রমণ্ডলীর আলো। সে সহ্য করতে পারল না। এবার স্বেচ্ছায় সে উচ্চারণ করল—কৈর্ময়াসহ বোদ্ধব্যম্ অস্মিনরণসমুদ্যমে॥

॥ পাঁচ ॥

কৌশিক বন্দোপাধ্যায়কে তেমন করে মনে নেই বনলতার। শুধু মনে আছে মাথায় বড় লম্বা ছিলেন ভদ্রলোক, বড় বেশী চওড়া ছিল কাঁধ। শুনেছিল ভাল স্পোর্টস্‌ম্যান। দেখেছিল একবার, যখন কনে দেখতে এসেছিলেন কৌশিক। সে সময়ে ভাল করে দেখবার ইচ্ছেও ছিল না বনলতার, কারণ সে জানত এ বিয়ে হবে না। শক্ত ঘাড়ে মাথা নামিয়ে বসে ছিল বনলতা—কোনো উত্তেজনা, হৃৎকম্প কিছুই ছিল না তার এবং ভাবতে আশ্চর্য লাগে লজ্জাও কিছুমাত্র বোধ করেনি সে। কৌতূহলবশতঃ একবার চোখ তুলেছিল—বিশাল দুই চোখ নজরে পড়েছিল। আর কিছু মনে নেই।

সকালেই বেরিয়ে গেছে জগন্নাথ। বলে গেল কাজে বেরোচ্ছে, সেখান থেকেই সোজা কলেজে যাবে, আজ খাবেনা বাড়ীতে। খুব অন্যমনস্ক আর বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল তাকে যখন সে বেরিয়ে যায়। দাড়ি কামায়নি, ভাল করে স্নান করেনি আজ। ভাল করে কথা বলছিল না কাল রাত থেকেই—কোথাও কিছু ঘটে থাকবে যা বনলতা জানেনা। বিয়ের একমাসের মধ্যেই বিরক্তি ধরল কি জগন্নাথের! বনলতা বোঝে না।

জগন্নাথ বেরিয়ে গেলে কাজকর্মে অবসাদ আসে তার। নিজের জন্য কিছুই করতে ইচ্ছে করেনা—স্নান খাওয়াটাকেও বাহুল্য বলে মনে হয়। ঘুরে ঘুরে সে তাই এক মাসের চেনা ফ্ল্যাটটাকেই দেখছিল। দরজায়, নেমপ্লেট বসিয়েছে জগন্নাথ—প্রফেসর জে, বোস এম, এ, ডি, ফিল্। সে ফলকটার ওপর কয়েকটা আঙুল রাখল কিছুক্ষণের জন্য। একটু অহঙ্কারের হাসি মুখে ফুটে উঠল তার। কে বিশ্বাস করবে যে সদর দরজা এঁটে দিলে ঘরের মধ্যে জগন্নাথ অতটা বিচ্ছু! বাইরে তেমনি স্মার্ট নয় জগন্নাথ, কথাবার্তায় পটু নয়

তেমন, একটু গম্ভীর প্রকৃতির বলে মনে হয়। আসলে ঘরকুনো, অলস, আর বড় বেশী শান্তিপ্রিয়। বাইরে গাম্ভীর্য দিয়ে এই স্বভাব ঢেকে রাখে সে।

সদর দরজা বন্ধ করে ঘরে আসে বনলতা। সমস্ত শরীর অলস, ছেড়ে দেওয়া ভাব। গতকালের খবরের কাগজে কৌশিকের ছবি বেরিয়েছে—বিলেত চলে গেল। জগন্নাথ বলছিল মনের দুঃখে ভদ্রলোক চললেন ইংলণ্ডে। ছবিটা একবার দেখতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু লজ্জায় জগন্নাথের সামনে দেখেনি বনলতা—কাগজটা নিয়েও হেলাফেলার ভাব দেখিয়েছে। এখন কাগজটা খুঁজে দেখল পুরোনো খবরের কাগজের থাকে। নেই। বইয়ের র‍্যাক, র‍্যাকের পিছনে, কোণায় কোথাও নেই। মনে পড়ল ঠিক ঝি উনুন ধরাতে কাগজ নিয়ে যায়, রান্নাঘরে কয়লার ঝুড়ির ওপর জমানো আছে কাগজ। সেখানেও খুঁজে দেখল বনলতা। নেই। ভ্রূ কুঁচকে অন্যমনস্ক বনলতা রান্নাঘরেই দাঁড়িয়ে ছিল। কোথায় গেল কাগজটা! মঙ্গলা পুড়িয়ে ফেলে থাকবে হয়তো। একটু হতাস বোধ করে সে।

শ্বাস ফেলে আবার শোবার ঘরে আসে। রান্না-বান্না করবে না আজ। একার জন্য কে আর অতটা করে। কিছু একটা পড়লে সময় কেটে যেত, কিন্তু র‍্যাকের তাক ভরা জগন্নাথের ইংরিজি বই। কিছুদিন ফরাসী ভাষা শিখেছিল জগন্নাথ—সেই সম্পূর্ণ অচেনা ভাষারও কয়েকখানা বই রয়েছে। বাংলা বই যে ক'খানা আছে তার সব কটা বনলতার অনেকবার করে পড়া।

র‍্যাক থেকে একটা ফরাসী বই-ই টেনে নিল সে। একটা বালিশ মেঝেতে ফেলে গড়িয়ে পড়ল। উপুড় হয়ে বইটা খুলে ভ্রূ কোঁচকায় সে—এমন ভাষায় ফরাসীরাও বা কি করে কথা বলে। উল্টে পাল্টে সে বইটা দেখছিল—কয়েকটা ছবি রয়েছে, ফরাসী দেশের নিসর্গ ও নগরের দৃশ্য। অচেনা দেশ, ঘরবাড়ী, অচেনা মানুষ পথ দিয়ে হাঁটছে। দেখতে দেখতে দূরে চলে যাচ্ছিল তার চেতনা। কত দূরে দূরেও

রয়েছে মানুষ যাদের সঙ্গে তার কোনো যোগসূত্র নেই। বনলতা নামে কেউ যে রয়েছে এখানে, কলকাতায়—কেউ কি জানে? ছোট্ট ফ্ল্যাট, ছোট্ট সংসার—সে জানে অল্প, চায় অল্প, খোঁজে অল্প,। এত অল্পের মধ্যে রয়েছে অচেনা বনলতা—কেউ জানেও না। মৃদু হাসি লেগেছিল তার ঠোঁটে। বই পাশে রেখে দিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে থাকে সে। না, যা অচেনা, যা মহৎ, যা রহস্যময় তার কোনোটাই চায় না সে। ও সব কিছুর মধ্যেই মানুষের অমোঘ নিয়তি থেকে যায়।

কৌশিক চলল বিলেতে। এতক্ষণে হয়তো তার উড়ো জাহাজ পৌঁছে গেছে। মাত্র একদিনের দেখা সেই লোকটার জন্য হঠাৎ বুকের মধ্যে হু-হু করে ওঠে বনলতার। সে জানে জগন্নাথ স্কলারশিপ খুঁজছে, সুযোগ তৈরী করবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন সেও রওনা দেবে। কেন যায় অতদূরে মানুষ? তার মন খারাপ হয়ে যায়। এমন বিচ্ছিরি আবেগ-প্রবণতা তার! ছেলেবেলায় ষ্টেশন থেকে গাড়ী ছেড়ে যেতে দেখলে কান্না পেতো, খুব বড় ফাঁকা মাঠ দেখলে, মেঘশূন্য প্রকাণ্ড আকাশ দেখলে, শবানুগমনের হরিধ্বনি শুনলে মন খারাপ হয়ে যায় আজো। ঠিক সেই রকম মন খারাপ হয়ে যায় দূর বিদেশে কেউ চলে যাচ্ছে শুনলে।

শুয়ে থেকে সে দেখতে পেল খাটের তলায় এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে খবরের কাগজ। জগন্নাথের কাণ্ড। সারাদিন যতক্ষণ থাকে বিছানায় হুলুস্থূল করে। দেয়াল আর খাটের ফাঁক দিয়ে কাগজটা পড়েছিল মেঝেতে—তাই বনলতা খুঁজে পায়নি। এটাই কিনা কে জানে! তবু কৌতূহলবশতঃ উঠে হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকে কাগজটার জন্য হাত বাড়াল। দেখতে পেল খাটের প্রায় অন্ধকার পায়ার কাছ থেকে একটা ইঁদুর তার দিকে চেয়ে আছে। বনলতা তার চোখে চোখ পড়তেই বলল 'টু—কি!' ইঁদুরটা লাফিয়ে পালায়। মুখে মৃদু হাসি, কাগজটা টেনে নিয়ে মেঝের ওপর সেটার ধুলো ময়লা ঝেড়ে ফেলে দুয়ের পাতাটা খোলে সে। খবরের কাগজ থেকে

কৌশিক বনলতার দিকে চেয়ে হেসে আছে। বনলতা ছবির দিকে চেয়ে রইল। বয়স সাতাশ-আঠাশের বেশী নয়, ছবিতে আরো ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। গলায় টাই বাঁধা, পরণে স্যুট—বাঙালী বলে চেনাই যায় না। শক্ত কাঠামোর ওপর প্রাণসার চেহারা—চোখের চাউনীতে হাসিটা ছড়িয়ে রয়েছে, তবু বোঝা যায় সহজে পোষ মানে না, যা চায় তা সহজে ছেড়েও দেয় না। ঠিক তার বাবার মতো। বাবার কথা মনে হলে সে একবার ভ্রূ কোঁচকালো, পর মুহূর্তেই ছবির দিকে চেয়ে মৃদু একটু হেসে বনলতা ফিস্‌ফিস্ করে বলল—'হাউ-ডু-ইউ-ডু?'

তারপর হেসে গড়িয়ে পড়ল বালিশে। একরাশ এলোচুল ছড়িয়ে পড়ল চারধারে। বুকের ওপর খোলা খবরের কাগজ মৃদু হাওয়ায় পাশ ফিরছে। ইঁদুর কাগজ কাটছে কোথাও—কুট্‌কুট্ শব্দ। সেই ইঁদুরটাই কি, যে বনলতাকে দেখছিল খবরের কাগজ তুলে নিতে? আর কোনো শব্দ নেই, শহরতলীর ভিতরে ক্রমশ প্রবেশ করছে ঝিম্‌ঝিম্ দুপুর। স্নান করেনি বনলতা, খায়নি কিছু দুপুরে। সেই অবস্থাতেই ঘুম পাচ্ছিল। মেঝের নীচে মাটিতে গভীর থেকে উঠে আসছে শীতলতা, ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। সে নিজের মাথার ভিতরে এক বিষণ্ণ উড়ো জাহাজের শব্দ শুনতে পায়। কে যেন কেবলই দূরে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে তাকে একা রেখে। মনের ভিতরে, মাথার ভিতরে কোথায় যেন আড় হয়ে বসে আছে ছোট্ট একটি কাঁটা। কখনো কখনো ভুলে সে স্পর্শ করে কাঁটাটিকে। চিন্তার ভিতরে, কাজ ও অবসরের ভিতরে ঘুমের ভিতরেও তাই হটাৎ, হঠাৎ কেঁপে ওঠে বনলতা।

জগন্নাথ কখন আসবে কে জানে। কলেজে বাঁধা ধরা ছুটির সময় নেই, কখনো হুট্ করে চলে আসে, কখনো দেরী হয়। আজ হয়তো দেরী হবে। কলেজ থেকেই যে সোজা ফিরবে জগন্নাথ এমন কোনো কথা নেই। কাল থেকে দেখছে, জগন্নাথ বড় অন্যমনস্ক, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

ওই ইতর ছেলেগুলোর সঙ্গে কেন যে ও ঝগড়া করতে গেল। কয়েকবার 'কী হয়েছে,' জিজ্ঞেস করে 'কিছু না' গোছের এড়িয়ে যাওয়া উত্তর পাওয়া গেছে। বেশী জানতে চাইতে লজ্জা করে তার। একমাস পুরো হয়নি, ভাদ্রের দু তারিখে কলেজে যেতে বই খাতা নিয়ে বেরিয়ে বিয়ে করতে গেল বনলতা, বুড়ো দাদুর মতো ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সামনে দাঁড়িয়ে দু'জন গড় গড় করে সরকারী মন্ত্র পড়ল। স্নায়বিক উত্তেজনায় জগন্নথের গলা কাঁপছিল, মুখচোখ কি সিরিয়াস দেখাচ্ছিল তার! ভাবতে হাসি পায় এখন। বিয়ে হয়ে গেলে নার্ভাস জগন্নাথ খামোখা হেঁট হয়ে রেজিস্ট্রারের পায়ের ধূলো নিল, দেখাদেখি বনলতাও। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে যে কেন হেসে ওঠেনি তা আজও বোঝে না। পাশাপাশি হেঁটে বেরিয়ে আসবার সময়ে সে ফিস্ ফিস্ করে জগন্নাথকে বলল 'এটা বিয়ে নাকি! এটা কি বিয়ে?' পিছনে ও সামনে সাক্ষ্যদানকারী বন্ধু ও বান্ধবীরা ছিল, তাই লজ্জিত জগন্নাথ তার প্রায় সাদা ঠোঁট নেড়ে আস্তে আস্তে জবাব দিল 'আমারও ভাল লাগছে না।' সেই থেকেই জগন্নাথকে খুব কাছে দেখছে—কখনো বিষণ্ণ, কখনো অতিরিক্ত প্রেমিক কখনো দুশ্চিন্তায় কাঁটা হয়ে আছে। এখনো অনভ্যাস রয়ে গেছে বনলতার—এত কাছ থেকে চেনা ছিল না তো জগন্নাথকে। নতুন পাড়া, নতুন ফ্ল্যাট, অচেনা লোকজন। এ কোথায় এল সে! ভাবতে ভাবতে উঠে বসে বনলতা। বুঝতে পারে ঘুম আর হবে না আজ। এলো চুল মুঠোয় ধরে শূন্য চোখে চেয়ে থাকে। বুকের কাছেই রয়েছে অদেখা বিদেশ, আর বিদেশের ভয়।

একটু চা করবে কিনা ভাবতে ভাবতে উঠে এলোমেলো পায়ে ঘরটার চার ধারে কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করল সে। অচেনা ছায়া পড়ে থাকে ঘরের আনাচে কানাচে। বই থেকে মুখ তুলে, কিংবা আয়নায় নিজের মুখের পিছনে হঠাৎ তাকিয়ে, কিংবা রাতে ঘুম ভেঙে জলের গ্লাশের জন্য হাত বাড়িয়ে খুঁজতে গিয়ে কতবার চমকে ওঠে

সে, অচেনা লম্বাটে ছায়া ধর্ষনষ্টকারী পুরুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে আয়নার পিছনে, দরজার কপাটের সঙ্গে গা মিলিয়ে, টেবিলের তলায় নীচু হয়ে ঢুকে চেয়ে আছে তার দিকে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বনলতা এ সব অনুভূতির কথা ঠিক ঠাক বুঝিয়ে বলতে পারবে না। শুধু নিজেকেই অথৈ রহস্যের মতো মনে হয় তার। এমন হ'ত না যতদিন বাবার কাছে ছিল।

আপন মনে হাসতে থাকে সে। দাঁড়িয়ে ঠিকঠাক করে এলো খোঁপা বেঁধে নেয়। রান্নাঘরে যাবে বলে ভিতরের দরজার চৌকাঠের কাছে এসেছিল সে। খুব জোরে কড়া নড়ে উঠল হঠাৎ। চমকে ওঠে বনলতা—জগন্নাথ নয়, এত জোরে সে কখনো শব্দ করে না। মুহূর্তেই জড়তার ভাব কেটে গেলে সে তাড়াতাড়ি শাড়িটা গুছিয়ে নিচ্ছিল। কড়া নড়তেই থাকে, বনলতা সাড়া দিল—যাই।

দরজা খুলে দেখে হাতে সন্দেশের বাক্স আর একগাল সরল হাসি নিয়ে বিশু দাঁড়িয়ে আছে।

—ওমা! বনলতা চোখ কপালে তোলে—তুই!

—আমিই! হেসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে—একটা প্রণাম করব?

তড়িতে পিছু সরে গিয়ে বনলতা চেঁচাল—এই, ভাগ্!

ঘন নীল টেরিলিনের শার্ট গায়ে, পরনে চাপা সাদা জিন-এর প্যাণ্ট, বুকের বোতাম খোলা—সেই বে-পরোয়া বিশু। বিশুর মুখ থেকে কখনো হাসি যায় না। মাথা নেড়ে বলল—যা দেখালি কাণ্ডকারখানা একটু পায়ের ধুলো নিয়ে রাখা ভাল।

দরজা ছেড়ে দিয়ে মুখ টিপে হাসে বনলতা—ভেতরে আয়।

কতদিন আসে নি বিশু, খোঁজ নেয় নি তার! হঠাৎ কানায় কানায় ভরে উঠল বনলতার মন। বিশু ভেতরে এলে সদরে খিল দেয় বনলতা, সন্দেশের বাক্স দেখিয়ে বলে—এ সব আবার কবে শেখা হ'ল শুনি!

—শিখছি। হাতের বাক্সটা বাড়িয়ে দেয় বিশু—নিয়ে নাও হে এই বেলা।

ভ্রূ কুঁচকে তাকাতে গিয়ে হেসে ফেলে বনলতা—টিকটিকি কোথাকার, এখানকার ঠিকানা পেলি কোথায়। বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে সন্দেশের বাক্সটা নেয়।

—পাই নি তো কোথাও! বিশু অবাক-গলায় বলে—রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এ বাড়ীর সদরে দেখি জমকালো নেলপ্লেট লাগানো। চেনা মানুষ ভেবে ঢুকে পড়েছি।

—বদমাশ! বনলতা হাসে—বোস না ঐ বিছানায়। এখনো সব গোছানো হয় নি রে, কিছু মনে করিস না।

কোথাও জড়তা নেই বিশুর হাব-ভাবে। জগন্নাথের ছেড়ে ফেলা ধুতি গেঞ্জী বিছানার ওপর পড়ে ছিল। বিশু সেগুলো ছুঁড়ে বিছানার অন্যধারে পাঠিয়ে বসল। দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বলল—কি খাওয়াবি শুনি!

বনলতা ঠোঁট ওলটায়—রান্নাই হয় নি আজ।

—কোনোদিন হয়?

—মানে!

বিশু একটা বালিশ টেনে নিয়ে কাৎ হয়ে পড়ে বলল—মানে একটা ধরে নে না যা সাজিয়ে গুছিয়ে আছিস্…।

—এই তো বেশ। বনলতা হাসে—বললি না কি করে খোঁজ পেলি? আমরা ত পালিয়ে আছি।

—লোক লাগিয়েছিলাম। সে তোর হাজব্যাণ্ডকে কলেজ থেকে ফলো করেছিল বাসা পর্যন্ত।

—ওমা! বনলতা চমকে উঠেই আবার হাসতে থাকে, মুখে আচল চাপা দেয় পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলে—এতটা করতে গেলি কেন? আর তো কেউ খোঁজ নেয় না। তুই কেন এলি!

তাই তো ভাবছি, কেন এলাম। বিশুকে গম্ভীর দেখায়। বনলতা

বোঝে ভিতরে ভিতরে ও হাসছে। বিশু ঐ রকম, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না তার। এমন কিছু বয়স নয়, চব্বিশ পঁচিশ হবে। এই বয়সেই রাণাঘাটের কাছে কোথায় যেন পোলট্রি করেছে। হাঁস মুর্গী নিয়েই মেতে আছে যে তা নয়, এটা ওর এক্সপেরিমেণ্ট। ভাল না লাগলে আবার ছেড়ে ছুড়ে দেবে। কত কিছুই শুরু করল বিশু, শেষ করল না।

—কেমন আছিস! বড় উদাস শোনাল বিশুর গলা!

—ভাল লাগে বুঝি! বনলতা এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে বলল—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এলাম, প্রায় এক বস্ত্রে!

বিশু হাসল, শব্দহীন হাসি। উদাস দেখাল তাকে।

—নাটক হয়ে গেল' না রে? বনলতা হাঁটতে হাঁটতে ভিতরের দরজার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে।

—একটু।

—তা হোক, বেশ করেছি। অস্থিরভাবে সে আবার টেবিলের কাছে আসে, জগন্নাথের টুথব্রাশটা খামোখা তুলে নিয়ে আবার শব্দ করে ফেলে দেয়, পরমুহূর্তে একটু লাজুক হেসে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলে—একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

—বল না।

—সত্যি করে বলবি কে পাঠিয়েছে তোকে?

বিশু আবার হাসে—যা ভাবছিস তা নয়।

—কি ভাবছি!

—যার কথা ভাবছিস সে পাঠায়নি আমাকে। বিশু মাথা নাড়ে হি ইজ্ এ টাফ্ গাই।

—কার কথা ভাবছি কি করে বুঝলি?

—বোঝা যায়। বিশু বলে—একজনের কথাই তুই ভাবতে পারিস।

বনলতা থমকে গেল। ক্রমশঃ মুখচোখ কোমল হয়ে এল তার

চোখের পাতা ভারী হয়ে নামল। প্রায় স্খলিত কণ্ঠে বলল—আমার আর কেউ নেই, সে তুমি জানো।

অন্যসময়ে হলে বনলতার এ কথা হাস্যকর শোনোত বিশুর কাছে। বলে ফেলেই বনলতার ভয় করছিল। কিন্তু বিশু হাসল না, স্বাভাবিক চপল গলাতে বলল—এখন আর একজন তো হয়েছে তোর। প্রফেসর জে, বোস, এম, এ, ডি, ফিল্।

—হয়েছেই তো! বনলতা গলা চড়াল।

—আরো হবে। আপনজন মানুষের বেড়েই যায়।

—থাক্। বনলতা বলল—একটু বোস, চা তৈরী করি।

—আমার জন্য কষ্ট করতে হবে না। চা ছেড়ে দিয়েছি, প্রায় দুধ খাই এখন—খাঁটি গরম দুধ।

বনলতা ঠোঁট ওল্টাল—তোমার জন্যে চা করছিনা, নিজের জন্যেই করতে যাচ্ছিলাম। আর দুধ টুধ চেওনা, ওসব কলকাতার ফ্যাশান নয়।

বনলতা চলে যাচ্ছিল। বিশুই ডাকল আবার—এই, শুনে যা!

—কি! ভিতরের দরজার চৌকাঠ থেকে মুখ ফেরাল বনলতা।

—কাছে আয়।

বনলতা আস্তে আস্তে ফিরে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ায়। তার বুক কাঁপছিল এবার, বিশুর গলা শুনে। প্রায় ফিস ফিস করে বলল—কি বলছিস্!

—যার কথা ভাবছিস তার কথাই বলছিলাম। হঠাৎ গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলল বিশু, হাসিমুখেই বলল—তোর বাবার কথা। আজ সকালে এসে দেখা করতে গেলাম। দেখি বারান্দায় মোড়া পেতে বসে ব্লেডে নখ কাটছেন। স্বাস্থ্য তেমনি সাজ্ঘাতিক আছে, রঙ ফেটে পড়ছে গায়ে।

—ওঃ। একটু বিবর্ণ দেখাল বনলতাকে।

বিশু আঙুলে মাথার চুল জড়াচ্ছিল, বলল—কই খুশী হলি না

তো শুনে!

—ভালই তো। ভাল আছে যখন, আর চিন্তা কি? বনলতা বলল—দাঁড়া, আসছি।

—আর একটু দাঁড়া। হাসিমুখে বলল বিশু—বলছিলি সব ছেড়ে ছুড়ে এক বস্ত্রে চলে এসেছিস। কিন্তু মনে হচ্ছে কিছুই ছাড়তে পারিসনি।

—কিই বা ছাড়ার আছে। ভ্রূ কুঁচকে বলল বনলতা এখন বুঝতে পারছি ছেড়েই দিল সবাই।

বিশু তেমনিই হাসে, আঙুলে চুল জড়ায়। বলে—ঠিক।

—না। বিশ্বাস কর—তাড়াহুড়ো করে বলল বনলতা—আমি চাইনা আমার জন্য কেউ আর ভাবুক।

—ডক্টর বোসও নয়?

বনলতা হেসে ফেলল—এত বোকা তুই যে সেই একটা নামই করলি?

বিশু এবারে হাসল—তোর বাবার কথা এখনো শেষ হয়নি। যতদূর জানি তুই চলে আসাতে তিনি বিচলিত হননি, তোর বিয়ের পরদিনও অফিসে গেছেন।

বিরক্ত হয় বনলতা—তাতে কি হ'ল! আমারই বা কি বয়ে গেছে!

বিশু সহজ সুরে বলল—কিন্তু শুনলাম দিন কুড়ি আগে তোর বাবার একটা স্ট্রোক হয়—থ্রম্বসিস। বিচ্ছিরি অবস্থা হয়েছিল।

বনলতা উত্তর দিল না। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই হঠাৎ হিম হয়ে জমে গেল তার পা। বিশু তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিল, কি ভেবে আবার বসে পড়ল, বলল ঘাবড়াসনি, এখন ঠিক আছে। তবে আমার মনে হয় তোরা একটু খোঁজখবর করলেও পারতিস্। একেবারে ছেড়ে এলি কেন বুড়ো লোকটাকে?

বনলতা আস্তে আস্তে চোখের জল মুছল আঁচলে। বলল—

তাতে লাভ ছিল না কিছুই ; মেনে নিত না বাবা।

—মানবেনা কেন ? বোস খারাপ পাত্র নয়—আমিও খোঁজ নিয়েছি।

—সেটা আমি কম জানিনা। কিন্তু বাবা মাত্র এইটুকুই সহ্য করতে পারেনা যে জীবনে আমি একবারও জেদ রেখেছি, অবাধ্য হয়েছি তার। এখানে পাত্র বড় কথা নয়। কৌশিক ব্যানার্জিকে বাবার পছন্দ হয়েছিল, অথচ আমি জানি ওরকম একটা ছেলেকেও যদি আমি নিজের ইচ্ছেয় বেছে নিতুম, বাবা খুশী হ'ত না। বাবা ঐ রকম।

—যেখানেই হোক, যার কাছেই হোক সেই পোষ মানতেই তো হয়।

বোধ হয় চোখের জল গোপন করবার জন্যই বনলতা বিশুর দিকে পিঠ রেখে দাঁড়াল। ধরা গলায় বলল—কেন মানবো ?

হঠাৎ শ্বাস ফেলে বিশু বলল—বুঝলাম।

—কি বুঝলি ! বনলতা ম্লান হেসে মুখ ফেরায়—তোর তো চালচুলো নেই, আপনজন বলতে কেউ নেই। তুই কি করে বুঝবি ?

বিশু একইরকম হাসে—তা হলে বোধ হয় ঠিক বুঝিনি।

—মাঝে মাঝে মনে হয় একমাত্র সন্তান হওয়া ভাল নয়। তার ওপর মা মাসী পিসি গোছের কাউকে দেখিনি কখনো। সন্দেহ হয় আমার ভিতরে কিছু পুরুষালী স্বভাব রয়ে গেছে। তুই হয়তো ভাবছিস···বনলতা কথা শেষ করে না।

কি ভাবছি ?

তেমনি ম্লান হাসিটুকু মুখে মেখে বনলতা বলে—কি জানি ! হয়তো ভাবছিস আমি হৃদয়হীন, বাবার স্ট্রোক হয়েছিল শুনেও কেমন স্বাভাবিক আছি !

—না তো ! তোকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না। বিশু আস্তে করে বলে।

—কিন্তু আমি বেশ আছি। ভাল আছি। তুই বাবাকে বলিস। বনলতা প্রায় ক্রুদ্ধ গলায় বলে।

বিশু উত্তেজনাহীন হাসি হাসল—উনি তোর খবরের জন্য ব্যস্ত নন। আমিই বরং আজ জিজ্ঞেস করলাম তোর কথা, উনি শুধু বললেন যে, কোনো খবর রাখেন না। খুব স্বাভাবিক ভাবে বললেন। দীর্ঘশ্বাসও ফেললেন না, গম্ভীরও হয়ে গেলেন না।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল বনলতা, আঁচলে মুখ চেপে রুদ্ধশ্বাসে বলল—তবে তুই কেন এলি ?

একটু চুপ করে থেকে বিশু বলল—কাঁদছিস কেন ? যা করেছিস তা ভালই ! অন্যায় তো কিছু নয়।

—বলছিস্ তুই ! বনলতা তখনো কাঁদছিল—কিন্তু তুই বললে কি আসে যায়। তুই আমার কে ?

—কেউ না। বিশু হাসল।

—ছেলেবেলায় জানতুম তুই আমার ভাই। বড় হয়ে ভুল ভাঙল, দেখি তুই আমার কেউ না, রক্তের সম্পর্ক নেই। ও রকম ভুল কেন শেখানো হয়েছিল তবে ?

বিশু হাসে—কি সব বলছিস ! অনেক সময় ভাল হবে ভেবেই লোকে ভুল শেখায়।

হবে। বনলতা দুই লাল ছলছলে চোখ বিশুর চোখে রাখল, ধীর গলায় বলল—কে জানে আরো কত কি ভুল শিখে বসে আছি ! একদিন হয়তো জানব যাকে বাবা বলে জানি, কিংবা যাকে স্বামী বলে জানি তারা কেউই আমার কিছু নয় ! দুম করে বোমা ফাটিয়ে কানের কাছে এসব কথা বলে যাবে কেউ।

বিশু হঠাৎ মাথা নামিয়ে ভিন্ন সুরে বলল—হ্যাঁরে, তোর কর্তা সিগারেট খায় না ? আমার ভীষণ সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। থাকে তো দে না।

বনলতা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বিশু বলে—

চা করলি না। মাথা ধরে গেছে কিন্তু।

বনলতা হাসল, হঠাৎ তার দুই চোখ স্নেহে লেহন করল বিশুকে। ধরা গলায় বলল—তবু কেন যে তোকে এত ভালবাসি বুঝি না।

বিশু দুই হাত তুলে বলল—থাম্। স্পষ্টতই অস্থির দেখাল বিশুকে। গম্ভীর হয়ে বলল—তোর হয়তো মনে নেই, কিন্তু আমার আছে। ছেলেবেলায় যখন আমাদের প্রথম দেখা হয় তখন একবার তুই আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলি। আমি তোর বাবাকে বলে দেব বলে ভয় দেখিয়েছিলাম তোকে।

—যাঃ! খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে বনলতা, হাসতে হাসতে কোমর ভেঙে উপুড় হয়ে কাঁপতে থাকে। চেঁচিয়ে বলে—কে বলল মনে নেই! তারপর সামলে নিয়ে আবার দাঁড়ায় বনলতা, মুখে হাতচাপা দিয়ে স্মিত গলায় বলল—সে তখন বিয়ের মানে বুঝতুম না বলে।

—এখন বুঝিস? বিশু স্নিগ্ধ গলায় বলে!

—বনলতা কথা না ব'লে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

—ছাই বুঝিস্। বিশু উদাস গলায় বলে।

—মানে?

—মানে বললে তুই খুশী হবি না।

বনলতা ভ্রূ কোঁচকায়—যেন কত খুশী হওয়ার মতো কথাবার্তা বলছ আজ।

—বলব? বিশু হেসে বলল—তুই বরাবর নাটক করতে ভালবাসিস। বোসকে বিয়ে করার জন্য ততটা নয়, যতটা নাটক করার জন্যই তুই হঠাৎ বিয়েটা করলি। নইলে এটা নেগো-শিয়েট করার সুযোগ ছিল।

—ছাই। বনলতা থমথমে মুখে বলে—বাজে কথা বলিস না।

—হয়তো আমারই ভুল! বলে বিশু—এবারে একটু চা কর, বনা!

কি বলবে বলে একটু ইতস্তত করল বনলতা। তারপর ফিক্ করে হেসে বলল—একটা কিম্ভুত তুই। পর মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেল।

—তোর কথা কিছুই শোনা হল না। কিছু বলছিস না কেন, এই! বিশুর হাতে চায়ের কাপ দিয়ে বলল বনলতা। তারপর বসল খাটের ওপর—পাশাপাশি—হেসে বলল—কোথায় যেন কি সব ছাইভস্ম করছিস! একদিন তো নিয়েও গেলি না দেখাতে।

বিশু বেদম জোরে চুমুক দেয় চায়ে। উত্তর দেয় না। বনলতা ওর চুলের মুঠি ধরে নেড়ে দিল—এই!

—কি বলব? বিশুর গলা উদাস।

—তোর কথা বল। কেমন আছিস ওখানে?

—ভাল। চমৎকার!

—দু চোখের বিষ। বনলতা স্নিগ্ধ হাসে—মন কেমন করে না তোর!

—কেন করবে? হঠাৎ বিশুর গলা খুব নরম শোনাল।

বিশুর চোখ টানা টানা নয়, সুন্দর নয়, তবু বনলতা দেখল কয়েক পলকের জন্য সেই চোখ স্বপ্নাতুর হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে দূর গলায় বলল বিশু—জানিস্ আমি একটা পুকুর কেটে মাছ ছেড়েছিলাম। এখন সেগুলো বড় হচ্ছে। আমাকে চিনেছে ওরা, হাত থেকে খাবার ঠুকরে খেয়ে যায়, ভয় পায় না। আমার মুর্গীগুলো কাঁধে এসে বসে, মাথায় ঠুক্‌রে দিয়ে চেঁচায়। হাঁসগুলোও এমন চিনেছে, আমার সাড়া পেলে জল থেকেও ছুটে আসবে।

কথা বলতে বলতে থেমে তেমনি চেয়ে ছিল বিশু। হাতের চা জুড়িয়ে যাচ্ছে, খেয়াল ছিল না ওর। সামনের দেয়ালের দিকে চোখ, অথচ দেয়ালেও নয়, কোথাও নয়। একটু অস্থির বোধ করে বনলতা—সেই অধিকার, সেই ভালবাসার কথা এখানেও! বিশু হঠাৎ হাসে, মুখ ফিরিয়ে বলে—যাবি একদিন? চল্ না!

—যাব। বনলতা বলল—কিন্তু তোর মাছগুলো কি আমার হাত থেকে খাবে! ভয় পাবে না!

বিশু ঠক্ করে চায়ের কাপ রেখে দিল। বলল—আজ ফিরে

যাবে। ট্রেন একটা রয়েছে এখন। হাত বাড়িয়ে বনলতার একটা হাত টেনে নিল—বেষ্ট অব্ লাক্, বনা। চলি।

চোখে জল টলমল করছিল বনলতার, বলল—আবার কবে আসবি? জেড়ে দিবি না বল!

—দূর পাগল। প্রায়ই আসব। বিশু হাসে—আচ্ছা, বনা। হাত তুলল।

দরজা খুলে বারান্দায় নামল বিশু। তারপর রাস্তায়। ঘুরে তাকিয়ে হাসল। বনলতা দরজার কাছ থেকে হাত তুলল, ফিস্ ফিস্ করে বলল—আচ্ছা, বিশু!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দরজায়।

দরজা বন্ধ করতেই গাল বেয়ে চোখের জলে বুক ভাসল বনলতার! অকারণ। আগে লক্ষ্য করেনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে সমস্ত ঘর জুড়ে আছে শূন্যতা। সে যেন কূল কিনারা পায়না। বনলতা হঠাৎ হাত জোড় করে বুকে রাখে। অনুভব করে বহু যোজন বিস্তৃত এক শূন্যতা রয়েছে চারিদিকে, যার হাতগুলি পড়ে আছে সারা পৃথিবীময়। কোথায় পালাবে বনলতা! বড় অসহায় সে আর তার হৃদয়। শুধু বোঝে তাকে একবার স্পর্শ করবে বলে—সে যে দিকেই পা বাড়াক—সে দিকেই শূন্যতার সেই হাত অঞ্জলি পেতে আছে।

॥ ছয় ॥

শিয়ালদায় এসে বিশু দেখল তার ট্রেনটা মিনিট দুই আগে ছেড়ে গেছে। পরের ট্রেন ঘণ্টা দেড়েক পর। এটা তার অন্যমনস্কতার দোষ। বনলতার কাছ থেকে চলে আসবার পথেই আস্তে আস্তে সে বিষণ্ণ আর অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। বাস স্টপের খুব কাছে এসে সে দেখতে পেল, একটা বাস এসে থামল। দৌড়োলে বা জোর কদমে হাঁটলে ধরা যেতো বাসটা। কিন্তু সে তা করেনি। বাসটা যে ধরা দরকার, নইলে যে ট্রেন পাওয়া যাবে না—এত কথা খেয়ালই হয়নি তার।

বারান্দা থেকে নেমে সে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে হাতটা তুলে বলেছিল, 'আচ্ছা, বনা, চলি।' দেখেছিল অত বড় বড় দুই চোখ ভরে জল টস্ টস্ করছে বনলতার। হাত তুলে ফিস্ ফিস্ করে বনলতা বলল, 'আচ্ছা, বিশু।' অমনি টপ্ করে জল ঝরে পড়ল চোখ থেকে। বিশু আর ফিরে তাকায়নি। জানে বনলতা এখন কাঁদবে।

আজ বনলতার ঘর-সংসার দেখে এল বিশু। আর বনলতাকেও। খুব বেশী প্রশ্ন করেনি বিশু, খুব বেশী জানতে চায়নি। বরং চুপ করে থেকেছে, বনলতাকেই কথা বলতে দিয়েছে বেশী। ভাল করে লক্ষ্য করেছে, ঘরদোর আর সাজানো-গোছানো সামান্য আসবাবপত্র। দেখার বেশী কিছু ছিল না, মাত্র একমাসের পুরোনো ওদের সংসার। তবু বিশু কিছু একটা অনুভব করতে চাইছিল। চোখ কান দিয়ে যা বোঝা যায় তা নয়। তার চেয়ে কিছু বেশী। ঠাট্টা করে বিশু বলেছিল, কি খাওয়াবি বল্! ঠোঁট উল্টে বনলতা বলল, 'রান্নাই হয়নি আজ।' মনে মনে একটু চমকে গিয়েছিল বিশু। কোনোদিন একবেলা না খেয়ে থেকেছে—বনলতা—এমনটা মনে পড়ে না। মা নেই বনলতার ছেলেবেলা থেকেই। ওদের বাপ-বেটির সংসারে তাই লক্ষ্মীপুজো, শিবরাত্রি বা ব্রত-র উপোস বলে কিছু ছিল না। সরস্বতী

পুজোর দিন অঞ্জলির দেরী হলে, কেঁদেছে সে অনেকবার। তাছাড়া বিশু জানে বনলতার সবচেয়ে প্রিয় খাবার ভাত। দিনে তিন চারবার সে ভাত খেতো। তাই রান্না হয়নি শুনে চমকে গিয়েছিল বিশু। তবু কোনো প্রশ্ন করেনি। যেন বনলতা না ভাবে যে বিশু গোয়েন্দাগিরি করছে। সে লক্ষ্য করল, বনলতার পরনে নোংরা বিশ্রী একটা শাড়ী খুব এলোমেলো করে পরা, চুল রুক্ষ—বোঝা যায় যে আজ চান করেনি। মেঝেতে একটা বালিশ আর খবরের কাগজ পড়ে ছিল। এখন গরমের সময় নয় যে মেঝেতে শুতে হবে। এইসব-গুলো মনে মনে যোগ করল বিশু। বনলতার জন্য বড় কষ্ট হচ্ছিল তার। যখন চা করতে গেল বনলতা তখন সামান্য কৌতূহলবশত মেঝে থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়েছিল বিশু। একদিনের পুরোনো কাগজ। বিশু জানে, কালকের কাগজে কৌশিক ব্যানার্জীর একটা ছবি ছাপা হয়েছে। কৌশিক বিলেত চলে গেল—এই খবরটা ছবিসহ ছাপা হয়েছে। বিশু দেখল, খোলা পাতায় কৌশিকের ছবিটাই রয়েছে। বনলতা এতক্ষণ এইটি দেখছিল!

না কৌশিকের সঙ্গে পরিচয়ও ছিল না বনলতার। শুধু একবার দেখা হয়েছিল যখন বনলতাকে দেখতে এসেছিলেন কৌশিক। কিন্তু সে সম্বন্ধ বনলতাই ভেঙে দিয়েছিল। তারপর মাসখানেক আগে সে জগন্নাথকে বিয়ে করল গোপনে, কাগজে সই করে। তারপর পালিয়ে এল। জগন্নাথকে কবে ভালবাসল বনলতা তা বিশু জানেই না। সে দেখেওনি ভদ্রলোককে। শুনেছে জগন্নাথ বোস অধ্যাপক, এম-এ ডি-ফিল।

তবে এখন দুপুরের নির্জন ঘরে পুরোনো খবরের কাগজ খুলে কৌশিকের ছবি কেন দেখছে বনলতা? সামান্য ভ্রূ কুঁচকে কথাটা ভাবতে ভাবতে বিশু আবার যেমন ছিল তেমনিভাবেই মেঝেতে রেখে দিল কাগজটা।

বনলতার ভালবাসার খবর বিশু রাখত না। সে জানে সহজে

কাউকে ভালবাসার মেয়ে নয় বনলতা। সে শুনেছে জগন্নাথের সঙ্গে বনলতার পরিচয়ও খুব বেশী দিনের ছিল না। এত সহজে কি করে বিয়ে হয়ে গেল, ভেবে পেল না বিশু। অনেক খুঁজে খুঁজে সে তাই ওদের ঠিকানা যোগাড় করেছিল। সময় বুঝে দুপুরবেলাতেই গিয়েছিল যাতে বনলতাকে একা পাওয়া যায় আর সারাক্ষণ চোখ-কান এবং চোখ-কানের অতীত একটা অনুভূতিকে সজাগ রেখে, বাইরে একটা হেলাফেলার লোকদেখানো ভঙ্গী করে বসে ছিল। খুব বেশীক্ষণ থাকেও নি সে। কিন্তু এখন দুপুরের প্রায় ফাঁকা শিয়ালদার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে তার মন বলছিল কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। বিশুকে দেখে এমন আকুল কোনো-দিন হয়নি বনলতা। ঠাট্টায় গাঁট্টায় তাদের সম্পর্ক ছিল। অথচ আজ চলে আসার আগে বনলতা তার দুই হাত ধরে বলল, 'আবার কবে আসবি ? ছেড়ে দিবি না বল !' তখন থেকে কথাটা মাথায় ঘুরছে বিশুর। কেবলই মনে হয়, কথাটা এমন ভাবে বলেছিল, বনলতা যেন তার মধ্যে একটা নিহিত অর্থ আছে। আজ বড় অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল বনলতাকে, বড় চঞ্চল অস্থির।

এটা সত্যিই ভালবাসা কিনা কে জানে ! বিশুর সন্দেহ হয় এখন। এমন হতে পারে যে, এটা বনলতার অ্যাডভেঞ্চার। রাশভারী বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে গোপনে অসবর্ণ বিয়ে করার মধ্যে একটু হয়তো উত্তেজনা আছে। তার বেশী কি কিছু ছিল ? আজকালকার বাঙালী মেয়েরা অধিকাংশই এরকম বিয়ে করে। না বুঝে, না জেনে, কেবলমাত্র নাটকীয়তাটুকুর জন্য কখনো বা সাময়িক ভাবাবেগের জন্য। বনলতা অতটা হালকা নয়। তবু বিশুর সন্দেহ হতে থাকে। বনলতা অতিমাত্রায় সুন্দরী, ইচ্ছেমতো যাকে খুশী বিয়ে করার সুযোগ তার ছিল। কিন্তু বিয়েটা কি সত্যিই ভেবে করেছে বনলতা ? সে ঠাট্টার ছলে আজ বনলতাকে বলেছে, 'আসলে তুই নাটক করতে ভালবাসিস। বোসকে বিয়ে করার জন্য ততটা নয়,

যতটা নাটক করার জন্য তুই এটা করলি। নইলে এটা নেগোশিয়েট করার সুযোগ ছিল।' শুনে খুশী হয়নি বনলতা।

প্ল্যাটফর্মে একটু পায়চারী করছিল বিশু। ঘড়িতে দেখল এখনো সোয়া এক ঘণ্টার ওপর দেরী আছে গাড়ির। সারাটা দিন তার কলকাতায় কাটল। এ শহরের ভীড় গণ্ডগোল এখন আর তার ভাল লাগে না। রানাঘাটের কাছে তার ছোট্ট পোলট্রিতে পোষা হাঁস মুর্গীগুলো তার অপেক্ষায় আছে। সে গেলেই ঝাঁপিয়ে আসবে, ঘিরে ধরে নিজেদের ভাষায় প্রশ্ন করবে তাকে এতক্ষণ কোথায় ছিলে? দেরী করতে ইচ্ছে করছিল না তার। অস্থির লাগছিল। তবু এক সময়ে পায়চারী থামিয়ে সে প্লাটফর্মের বেঞ্চিতে বসল। বনলতার জন্য তার অস্থিরতা আরো বেশী—এটা সে টের পাচ্ছিল।

অথচ ভেবে দেখতে গেলে বনলতা তার কেউ না। ছেলেবেলার বেশ দীর্ঘ একটা সময় সে বনলতাদের আশ্রয়ে ছিল। বনলতা জানত যে, বিশু তার ভাই। বিশু জানত যে, তা নয়। বনলতার মা ছিল না, ভাইবোনও আর কেউ ছিল না, শূন্য ফাঁকা বড় বাড়িটায় একা একা তার দিন কাটত না। তাই বিশুকে এনে দেওয়া হল তার ভাই বলে। বড় হয়ে উঠে বনলতার সে ভুল ভেঙেছিল। কেঁদে সারা হয়েছিল সে। তারপর বরং আরো গভীর হয়েছিল তাদের সম্পর্ক। বনলতা জানে, বিশু তার ভাইয়ের চেয়েও কিছু বেশী। বিশু জানে বনলতা তার বোনের চেয়েও কিছু বেশী। কিন্তু ঠিক যে কী তা কেউই জানে না। কিশোরী বয়সে একবার না বুঝে বনলতা বিশুকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বিশু আমাকে বিয়ে করবি?' সে কথা মনে পড়লে আজও হাসি পায় বিশুর। না, বনলতাকে কোনোদিনই বিয়ে করার কথা ভাবতে পারেনি বিশু। সে ছিল বনলতার খেলার পুতুল। বনলতা তাকে ঝিনুকে করে দুধ খাওয়ানোর নকল খেলা খেলেছে, ঘুম পাড়িয়েছে, কখনো বা পুতুলের মতো সাজিয়েছে তাকে।

বনলতার সেই সব আদর মনে পড়লে আজো মাঝে মাঝে মন উদাস হয়ে যায় বিশুর। সে জানে যে, সে প্রায় কুড়িয়ে পাওয়া ছেলের মতোই নিরাশ্রয় ছিল, দেশভাগের পর সেই ভীষণ গণ্ডগোল, অনিশ্চয়তায় দিশেহারা তার শিশুমনটি বনলতার কাছে এসে স্থির হয়েছিল। মাঝে মাঝে ভাবে বিশু একদিন যখন বনলতার সুখের সংসার ধনে জনে ভরে উঠবে তখন সে বনলতার কাছে গিয়ে বুড়ো বয়সে বলবে, 'বনা, একদিন আমি তোর ভাই ছিলুম, ছিলুম খেলার পুতুল, আজ তুই আমাকে তোর ছেলে করে নে। আমি তোর বুড়ো ছেলে বনা।' এসব কথা কখনো বনলতাকে বলেনি বিশু। শুনলে তেড়ে মারতে আসবে বনলতা। বনলতার বাইশ চলছে, আর তার সাতাশ।

তবু নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই বিশুর যে সে বনলতাকে ঠিক অতটা ভালবাসে। সে জানে, অন্তর থেকে জানে যে, বোন বলেই হোক, মা বলেই হোক—বনলতার সঙ্গে আমৃত্যু তার একটা সম্পর্ক থাকবেই। পৃথিবীতে তার সবচেয়ে প্রিয়গুলির মধ্যে একটি হচ্ছে বনলতা।

প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে একা বসে থেকে অনেকক্ষণ কেবল সিগারেট খেয়ে গেল বিশু। তার মন ভার লাগছিল। বড় অসুখী লাগছিল নিজেকে। বিয়েটা করার আগে বনলতা যদি একবারও মনে করে তাকে ডাকত! বিশু বনলতাকে কোনো ভুল করতে দিত না। অবশ্য বনলতা ভুল করেছে কিনা তা বিশু এখনো জানেনা। জগন্নাথকে বিশু এখনো দেখেনি।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সোজা হয়ে বসল বিশু। তাই তো? ইচ্ছে করলে জগন্নাথকে সে দেখে যেতেই পারে! দোষ কী? লেখা-পড়া বেশী শেখেনি বিশু, পণ্ডিত মানুষদের তাই সে এড়িয়ে চলে। তবু এখন সে সব সঙ্কোচ বড় একটা ভাবাল না বিশুকে। সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে সে উঠে পড়ল। গেট-এর টিকিট চেকারের বাড়ানো

হাত- খানা ঠেলে সরিয়ে সে তড়িৎগতিতে বেরিয়ে এল। জগন্নাথের কলেজ খুব বেশী দূরে নয়। ইচ্ছে করলে সে পরের ট্রেনটায় যেতে পারে কিংবা রাতের যে কোনো ট্রেনে।

বড় রাস্তায় এসে বিশু ট্রাম ধরল। জগন্নাথের কাছে নিজের কী পরিচয় দেবে সেটাই একটু ভাবছিল সে। যদি বলে যে, সে ওদের আশ্রিত ছিল, তবে হয়তো জগন্নাথ তাকে পাত্তাই দেবে না। তাছাড়া বনলতার সঙ্গে তার যে সরল একটা সম্পর্ক রয়েছে, সেটাও বাঁকা-ভাবে বুঝতে কতক্ষণ! তাছাড়া জগন্নাথের কাছে গিয়ে কীই বা জানবে বিশু! চেহারা দেখে আর দু-চারটে কথা বলে আর কতটুকু জানা যায়? আর যদি সত্যিই দেখে জগন্নাথ বনলতার ঠিক স্বামী নয়, যদি দেখে জোড় মেলেনি, তবে বিশুর আর কি করার থাকবে? চিরকালের জন্য বনলতাকে অসুখী জেনে ফিরে আসবে কি সে?

তবু তাও ভাল। রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাক। তারপর না হয় সে তার পোলট্রির হাঁস-মুর্গীর কাছেই পালিয়ে যাবে, আর আসবে না কখনো কলকাতায় কিংবা বনলতার মুখোমুখী হবে না কোনোদিন।

এক সময়ে তার এও মনে হল যে, সে অকারণ বাড়াবাড়ি করছে। আসলে পালিয়ে বিয়ে করার পর মনের অবস্থা এরকমই হয়। হয়তো বাবা বা বিশুর কাছ ছাড়া হয়ে থাকার প্রথম ধাক্কাটা লেগেছে বনলতার। আবার সামলে উঠবে। হয়তো জগন্নাথের সঙ্গে একটু মান-অভিমান চলছে তার। ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু আপনমনেই আবার মাথা নাড়ে বিশু। তা নয়। বনলতা নাড়ীনক্ষত্র তার জানা।

হু হু করে বয়ে যাচ্ছে ট্রাম গাড়ি। রড ধরে দাঁড়িয়ে একটু কুঁজো হয়ে বিশু তার স্টপ এল কিনা লক্ষ্য করছিল। ঘড়ি দেখল। তিনটে বেজে সাত মিনিট। এখনো জখন্নাথ কলেজে আছে কিনা কে জানে! যদি না থাকে, তবে বিশুকে আর একদিন আসতে হবে।

কলেজেই ছিল জগন্নাথ। ক্লাসে। একটু বসতে হল বিশুকে কমনরুমে। সে একটা সিগারেট ধরাল তারপর একটু ভেবেচিন্তে সেটা নিভিয়ে আবার পকেটে রেখে দিল। সামান্য স্নায়বিক উত্তেজনা বোধ করছিল সে। বনলতা আর জগন্নাথের ব্যাপারের মধ্যে সে একটু অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে। এতটা না করলেই বোধহয় ভাল হত। আবার পিছিয়ে যেতেও তার অনিচ্ছা। সে বার বার ঘড়ি দেখছিল। ক্লাস শেষ হতে এখনো মিনিট কুড়ি বাকী। সে খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে, এটাই জগন্নাথের শেষ ক্লাস। এরপর সে চলে যাবে। অল্পের জন্য সে জগন্নাথকে পেয়ে গেছে।

বসে বসে বনলতার কথাই ভাবছিল বিশু। কতভাবে জীবনকে এই অল্পবয়সেই দেখেছে বিশু। বনলতা দেখেনি। সে ছিল পুরুতের ছেলে। দেশভাগের পর এখানে এসে সে ফুটপাথে শুয়েছে, রাস্তায় কাগজ কুড়িয়েছে, চায়ের দোকানে বয়ের কাজ করেছে, কতরকমভাবে মার খেয়েছে লোকের কাছে। মাত্র সাত বছর বয়সেই তার বুড়োদের মতো পাকা মাথা তৈরী হয়ে গিয়েছিল প্রায়। সে জানে ক্রমে সে চোর-পকেটমারদের দলেও চলে যেতে পারত। অন্তত ঐ রকম উচ্চাশা ছিল তার। বনলতা কিছুই দেখেনি। আহা বনলতার জন্য তাই বড় মায়া বিশুর। এ জীবনের নোংরা বিশ্রী দিকটা সে কোনোদিন না দেখুক। কখনো সখনো বনলতার কাছে সে তার সাত বছরের অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। বনলতা কাঁদতো, মেয়েলী স্বভাববশত তাকে আরো বেশী ভালবাসতো। বড় হয়ে বিশু আর বলত না। থাক বনলতা সুন্দর আর সুকুমার থাক। অত বুঝে তার কাজ নেই।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চোখে জল আসছিল বিশুর। জাত-ধর্ম বনলতা বোঝে না। তাকে কেউ কখানো শেখায়নি। বিশু পুরুতের ছেলে। সে অনুলোম প্রতিলোম বোঝে। কিছুতেই তার সে সংস্কার যায় না। বোধহয় যাবেও না কোনোদিন। বামুনের মেয়ে

হয়েও বনলতা জগন্নাথ বোসকে বিয়ে করেছে। প্রতিলোম। প্রতিলোমজাত সন্তানেরা বর্ণশঙ্কর, সমাজের ক্ষতিকারক। এই বিয়ে বিশ্বাসঘাতকদের জন্ম দেয়। বনলতা এতসব জানেও না। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে বিশুও মানে না এসব। আজ যে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল, তার কারণ বোধহয় বনলতার ওই অসহায় ভাব আর অস্থিরতা। কি জানি, প্রতিলোম বলেই বোধহয় বনলতা সুখী হচ্ছে না! খুব উত্তেজিত হয়ে বিশু ভাবছিল ভবিষ্যতে সে সম্ভব হলে প্রতিলোম বিয়ে বন্ধ করারই চেষ্টা করবে।

ঘণ্টা পড়তেই বিশু উঠে দাঁড়াল। যে লোকের কাছে শুনে জগন্নাথের আবছা একটা চেহারা মনে মনে ঠিক করে রেখে ছিল সে কমনরুমের বাইরে এসে দাঁড়াল।

জনা দুই বয়স্ক প্রফেসর ঘরে ঢুকে গেল। তৃতীয়জন লম্বা ফর্সা, চোখে কালো ফ্রেমের ভারী চশমা। সুন্দর কিন্তু একটু মেয়েলী কোমল মুখশ্রী। এই জগন্নাথ—বিশু চিনে নিল। তারপরই এক-পা এগিয়ে পথ আটকাল 'আপনিই প্রফেসর বোস?'

ভীষণ চমকে গেল জগন্নাথ। যতটা চমকাবার কথা তার চেয়ে বেশী। তাকে বিবর্ণ এবং খুব বিচলিত দেখাচ্ছিল। গভীর কালো কিন্তু দুর্বল এবং অস্থির দুটি চোখে বিশুকে দেখে অল্প মাথা ঝাঁকাল জগন্নাথ, 'হ্যাঁ আমিই—কিন্তু—'

বিশু বুঝতে পারল জগন্নাথ শক্ত ধরনের পুরুষ নয়। এভাবে তার হঠাৎ পথ আটকানো ঠিক হয়নি। লজ্জা পেল বিশু। হাতজোড় করে বলল 'আমাকে আপনি ঠিক চিনবেন না। আমি বিশু। আমি বনলতার ভাই।'

তবু কিছুক্ষণ বুঝতে পারল না জগন্নাথ। বোকার মতো অসহায়ভাবে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তার মুখে বর্ণের পরিবর্তন দেখা দিল। সামান্য বেশী লাল হয়ে গেল তার মুখ। হাসল 'ওঃ হোঃ বিশু আরে, আপনি তো আমার মস্ত কুটুম!'

সামান্য ভড়কে গিয়েছিল বিশু প্রথমটায়। এখন জগন্নাথের ঠাট্টা শুনে হাঁফ ছেড়ে হাসল। বলল, 'বনার সঙ্গে দেখা করেই আসছি। আমি তো আর বিয়ের খবর পাইনি!'

জগন্নাথ হঠাৎ চোখের একটু ইশারা করে বলল 'বাইরে সব কথা হবে।' ইঙ্গিতে কমনরুমটা দেখিয়ে বলল 'এখনো সবাই ঠিক জানে না।'

রেজিস্টার খাতা দুটো কমনরুমের টেবিলে ফেলে দিয়েই বেরিয়ে এল জগন্নাথ। বলল 'চলুন।'

পাশাপাশি হেঁটে বেরিয়ে এল দুজনে। অনেকক্ষণ কথা বলল না জগন্নাথ। কলেজের এলাকা ছেড়ে যখন অনেকটা চলে এল দুজনে, যখন আর রাস্তায় ছাত্রদের দেখা যাচ্ছিল না, তখন থেমে একটা সিগারেট ধরাল জগন্নাথ। প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বলুন এবার।'

বিশু বলল, আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে এলাম।

'বেশ করেছেন। রানাঘাটে আপনার পোলট্রির কথা আমি শুনেছি একদিন যাওয়ার ইচ্ছে আছে।' তারপরই একটু হেসে জগন্নাথ বলল, বনলতা অতিথি সংকার ঠিকমতো করেছে তো!

বিশু হেসে মাথা নাড়ে আমি আপনার অতিথি। বনার নই। আপনি থাকলে ঠিক ঠিক সংকার হতে পারত।

এসব কথা বলার জন্যই বলছিল বিশু। কিন্তু সব সময়ে সে চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করছিল জগন্নাথকে। তার হাঁটার ভঙ্গী কথা বলার সময়ে তার ঠোঁটের নড়াচড়া, তার চোখ। ঠিক কী সে দেখতে চায় বা কী খুঁজছে সে তা নিজেও জানে না। সে অপেক্ষা করছিল। আরো একটুসময় লাগবে। সহজ ভদ্রতার কথাবার্তা বা লঘু ঠাট্টার ভিতর থেকে কিছুই বোঝা যাবে না। মানুষকে দেখতে হয় তার ঘটনার ভিতরে! ঘটনার প্রতিক্রিয়াই মানুষের চরিত্র

ধরিয়ে দেয়। সে যখন প্রথম পথ আটকাল তখন কেবল এইটুকু বুঝতে পেরেছিল, যে লোকটা শক্ত স্নায়ুর লোক নয়। অকারণ দুশ্চিন্তায় ভোগে। এবার আরো একটু জানতে হবে তাকে।

বিশু বলল 'চলুন কোথাও বসি।'

একটু সঙ্কুচিত হল জগন্নাথ 'কোথায়!'

'যে কোনো রেস্টুরেণ্টে।'

অপ্রতিভভাবে জগন্নাথ হাসল একটু, 'এ-সব রেস্টুরেণ্টগুলোতে আমার ছাত্ররা থাকে। ওদের সামনে—'

বিশু হাসল 'ছাত্রদের ভয় করলে চলবে কেন! ওরা যখন প্রফেসরদের ভয় পায় না, তখন আপনার মাথাব্যথা কিসের? চলুন—'

সামনেই একটা চায়ের দোকান। বিশু জগন্নাথের হাতে একটু চাপ দিয়ে তাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। মুখোমুখি বসল দুজনে। বিশু অনেক সহজ বোধ করছিল এখন, কিন্তু জগন্নাথকে কুণ্ঠিত এবং অপ্রতিভ দেখাচ্ছিল। মনে মনে বিশু স্পষ্টই বুঝতে পারছিল যে, সে জগন্নাথের ওপর এক ধরনের কর্তৃত্ব খুঁজে পাচ্ছে। বিশু একটু বেঁটে, মজবুত আথলীট ধরনের চেহারা, নিজের শরীরকে যেদিকে খুশী বাঁকাতে হেলাতে পারে বিশু, পরিশ্রম করার ক্ষমতাও তার প্রচুর। জগন্নাথ অনেকটা লম্বা। ঠিকমতো তৈরী হয়নি বলে অত লম্বা হওয়া সত্ত্বেও জগন্নাথের চেহারাটা মেদবহুল আর দুর্বল। শরীরের পরিশ্রম বোধহয় একেবারেই করে না জগন্নাথ। যখন রাস্তায় হাঁটছিল তখন বিশু দেখেছে জগন্নাথের পাঞ্জাবীর তলা থেকে পেটের চর্বি সামান্য ফুলে আছে।

এই লোকটাকে বনলতা ভালবাসে। ভাবতেই কেমন আশ্চর্য লাগছিল বিশুর। জগন্নাথের পাণ্ডিত্য কিংবা রুচি সব স্বীকার করে নিয়েও তার মনে কোথায় যেন বাধো-বাধো ঠেকছিল। নিজের সঙ্গে অকারণেই সে জগন্নাথকে মিলিয়ে দেখছিল। বনলতার বাবা,

তার কাকাবাবুর কথাও ভেবে দেখল বিশু। এখনো এই বয়সেও সাজ্ঘাতিক স্বাস্থ্য, রঙ ফেটে পড়ছে গায়ে, গমকী গলার স্বর। বাপের মতোই মুখশ্রী পেয়েছে বনলতা, সে রকমই রঙ। পিতৃমুখী মেয়ে—বনলতার সুখী হওয়ারই কথা ছিল। তার বাপকে দেখেছে বনলতা, বিশুকেও। স্বাভাবিক নিয়মে সে তার স্বামীর ভিতরেও তার বাবা কিংবা বিশুর মতোই কাউকে খুঁজতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। হতাশভাবে বিশু দেখে জগন্নাথের সঙ্গে তার কিংবা কাকাবাবুর এতটুকু মিল নেই। এঅন্য এক জগতের লোক। ভাল করে চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না, গলার স্বর মিহি সুন্দর আর হাবেভাবে নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্তের বড় অভাব। এ লোককে বনলতা কি করে ভালবাসে? হঠাৎ তার কৌশিক ব্যানার্জির কথা মনে পড়ল। ভাল স্পোর্টসম্যান ছিলেন কৌশিক। গতকালের কাগজে তার ছবি বেরিয়েছে, বনলতা সেই ছবিই দেখছিল দুপুরে। একা একা। আস্তে আস্তে শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল বিশুর। বনলতা কেন কৌশিকের ছবি দেখছিল? কেন?

জগন্নাথ সামান্য অস্বস্তির হাসি হেসে বলল—'ব্যাপারটা খুব হঠাৎ হয়ে গেল, না?'

অন্যমনস্ক বিশু জিজ্ঞেস করল—'কোন ব্যাপার?'

লাজুক মুখে জগন্নাথ বলে—'বিয়েটা?'

'বিয়ে!' বলে সকৌতুকে একটু চেয়ে রইল বিশু। লোকটাকে নিয়ে একটু খেলা করতেই ইচ্ছে করছিল তার। দুর্বল লোক দেখলে অপেক্ষাকৃত শক্তিমানদের যে মনোভাব হয় সেরকমই। নিজের ভিতর সামান্য একটু নিষ্ঠুরতাও অনুভব করছিল সে। বলল 'হ্যাঁ। বড় হঠাৎ হয়ে গেল। আমরা টেরই পেলাম না। আমাদের ইচ্ছে ছিল বনার বিয়েটা খুব ঘটা করে দিই।'

মাথা নাড়ল জগন্নাথ—'জানি ও আপনাদের খুব আদরের ছিল।'

হাসল বিশু—'এখনো আছে।'

আস্তে আস্তে জগন্নাথ বলল—'শুনেছি ওর বাবা এখনো খুব রেগে আছেন। মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক মানছেন না।'

টেবিলের ওপর ঝুঁকে ডান হাতখানা বাড়িয়ে বিশু জগন্নাথের কাঁধ স্পর্শ করেই আবার হাতটা টেনে নিল, বলল—'ওটা নিয়ে ভাববেন না। আপনারা সত্যিকারের সুখী হলে তিনিও একদিন মেনে নেবেন। এরকম তো আজকাল কতো হচ্ছে। তবে আমার মনে হয় আপনারা একবার গিয়ে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারতেন। তাতে ভাল হত।'

'কি হত?'

'তিনি একটু বুঝতে পারতেন যে তাঁকে একেবারে অস্বীকার করা হচ্ছে না।'

হাসল জগন্নাথ ওটা তো ফর্মালিটি। 'আপনার কি মনে হয় যে তিনি অনুমতি দিতেন এ বিয়ের?'

'না।' মাথা নাড়ল বিশু।

'তবে?' বলল জগন্নাথ 'তিনি রাগ করতে পারেন, কিন্তু আমরা যা করেছি তা ঠিকই করেছি।'

বিশু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, বনলতা 'আমাকে জানাতে পারত। আমি নেগোশিয়েট করার চেষ্টা করতাম।'

'আপনাকে!' বলে একটু দ্বিধায় পড়ে গেল জগন্নাথ। তার মুখভঙ্গী নিঃশব্দে বলে উঠল—'আপনি কে? আপনাকে জানাবে কেন বনলতা!' তারপরই সামলে গেল জগন্নাথ, বলল, 'আপনাকে জানানো যেতো। কিন্তু তার সময় ছিল না।'

সময় ছিল না! এত তাড়াহুড়ো! মনে মনে একটু উত্তাপ, একটু উষ্মা টের পাচ্ছিল বিশু। তবু চুপ করে রইল।

নিজেই আবার কথা বলল জগন্নাথ—'তা ছাড়া ঝামেলার দরকার কী? এই তো বেশ সহজ সরলভাবে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।' একটু চুপ করে থেকে অনাবশ্যকভাবে যোগ করল 'আমরা সুখী।'

বিশু হাসল। সে জানে এটুকুই হয়তো জগন্নাথের দুর্বলতা। সে বিশুকে জানাতে চায় যে তারা সুখী। নিছক কথা বলা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তার চোখ জগন্নাথের ওপর ঘুরছিল সে সজাগ রেখেছে কান, আর চোখ কানের অতীত আর একটা অনুভূতি।

জগন্নাথকে সামান্য উত্তেজিত করে দিতে ইচ্ছে করছিল বিশুর। ঠাণ্ডা কথাবার্তা বলে গেলে কোনো লাভ নেই। তাই সে হঠাৎ একটু হেসে দুম করে বলে ফেলল—'দেখুন, বনলতা যদি আজ আর কারো সঙ্গে পালিয়ে যায় এবং গিয়ে আপনাকে জানায় যে তারা সুখী, তাহলে আপনার কেমন লাগবে?'

কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেল জগন্নাথ। তার ফর্সা মুখ অল্প অল্প করে টকটকে লাল হয়ে উঠল। প্রথমে উত্তর দিতেই পারল না জগন্নাথ। তারপর হঠাৎ পিছনে হেলান দিয়ে হাসল, বলল—'সেরকম সম্ভাবনা আছে নাকি?'

এটা উত্তর নয়। বিশু দেখল যথেষ্ট উত্তেজিত হয়েছে জগন্নাথ। কিন্তু অসহায়ও বোধ করছে বড়। কিন্তু বলল—'আপনারা যদি সুখী হয়েই থাকেন তাহলে সে সম্ভাবনা অবশ্যই নেই। কিন্তু যদি এরকম ঘটতই তাহলে আপনার সম্মানে কিংবা অধিকারবোধে আঘাত লাগত না?'

উত্তেজিত জগন্নাথ মাথা নেড়ে বলল—'বোধ হয়।'

হাসল বিশু 'বনলতার বাবার কয়েকদিন আগে একটা স্ট্রোক হয়। থ্রম্বসিস। বিচ্ছিরি অবস্থা হয়েছিল।

জগন্নাথ নিরুত্তাপভাবে শুনল!

তাদের দুজনেরই চা জুড়িয়ে এসেছিল। এখন জগন্নাথ সেই ঠাণ্ডা চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে মুখ তুলল, একটু ভেবে বলল—'আমাকে আপনি কি করতে বলেন?' তারপর বিশু কোনো কথা বলার আগেই বলল—কিন্তু আমি ওর কাছে যেতে পারব না। ক্ষমা টমার কথাও বলতে পারব না। তবে বনলতাকে বলতে পারি যে সে যেন একবার

তার বাবার কাছে যায়।'

'তার দরকার নেই।' বলে শব্দ করে হাসল বিশু 'আর একটা কথা। বনলতাকে মেয়ে হিসেবে তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু জামাই হিসেবে আপনাকে করেন।'

জগন্নাথের ঠোঁট কাঁপছিল থরথর করে। তীব্র হয়ে উঠেছিল চোখের দৃষ্টি। প্রায় কাঁপা বিকৃত গলায় সে বলল, 'তাতে কিছু যায় আসে না। আই কেয়ার এ ফিগ ফর—'

কথাটা জগন্নাথকে শেষ করতে দিল না বিশু। দু হাত তুলে বলল, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনার শ্বশুরের সঙ্গে আপনাদের মিলন ঘটাতে আসিনি।'

কথা বলছিল না জগন্নাথ, কিন্তু তার দুই তীব্র চোখ বিশুকে নানা প্রশ্ন করছিল।

বিশু আস্তে আস্তে যেন বা জগন্নাথের ব্যথা বেদনার জায়গায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার মতো নরম ভঙ্গীতে বলল বরং আমি আপনাদের প্রেমের গল্পটাই শুনতে এসেছিলাম।

জগন্নাথ হাসল। 'কথা বলল না। বিশু বোঝে যে জগন্নাথ তাকে বিশ্বাস করছে না। সে তেমনি আস্তে করে বলল, বনলতার জন্য অনেক ভাল ছেলে পাওয়া গিয়েছিল। বনা কাউকে পছন্দ করেনি। আপনার মধ্যে বনলতা নিশ্চয়ই এমন কিছু পেয়েছে যা আর কারো ছিল না। আমি সেটাও দেখতে এসেছিলাম।'

শুনে খুশী হল না জগন্নাথ বরং বিরস মুখে ঠোঁট উল্টে বলল, 'কি জানি! আপনাদের বনাকেই জিজ্ঞেস করবেন।'

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়াল জগন্নাথ। বিশু বোঝার আগেই কাউণ্টারে গিয়ে চায়ের দাম দিয়ে দিল।

দুজনেই বেরিয়ে এল রাস্তায়। অন্ধকার হয়ে এসেছে।

অনেকটা পথ চুপচাপ হাঁটল জগন্নাথ বিশুর পাশে পাশে। তারপর হঠাৎ এক সময়ে বলল, 'দেখুন, আমি কষ্ট করে মানুষ হয়েছি।

আমার ডিগ্রী বা চাকরি অন্যের কাছে যত তুচ্ছই মনে হোক, এগুলোর জন্য কিন্তু আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। পার্টিশানের পর আমাদের আর কিছুই ছিল না, তারপর থেকে এক নাগাড়ে স্ট্রাগল। তাই নিজের কাছে বা নিজের পরিবারের কাছে আমি বড়ই, এতটা হওয়ারও কথা ছিল না আমার। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই শুনছি আমি পাত্র হিসেবে ভাল না, আমি সুন্দরী বনলতার উপযুক্ত নই। আমার বাড়ি থেকেও অসবর্ণ প্রতিলোম না কি যেন ইত্যাদি আপত্তি করা হয়েছে। আলাদা ফ্ল্যাটবাড়িতে আছি বনলতার জন্যই, নইলে এভাবে থাকার ক্ষমতা আমার নেই। বাড়িতে বুড়ো মা-বাবা, ছোটো ভাইবোনকেও আমার দেখতে হয়। খরচ বেড়ে গেছে, আরো খাটছি, তবু কেবলই নিজের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। মনে হচ্ছে কেউই সুখী হচ্ছে না। না বনলতা, না আমার পরিবার, না বনলতার পরিবার, না আমি।' একটু চুপ থেকে আবার জগন্নাথ বলল, 'উপায় থাকলে আমি বলতাম আপনাদের সুন্দরী বনলতাকে নিয়ে যান। যার সঙ্গে খুশী বিয়ে দিন। আমার কিছু বলার নেই আর।'

বিশু ভয়ঙ্কর চমকে উঠল। এত সহজে কথাটা বলবে জগন্নাথ তা সে ভাবেনি। দেখল জগন্নাথ রুমাল বের করে মুখ মুছবার ভান করে চশমার ফাঁকে চোখের কোল দুটিও মুছে নিল। বুকের ভিতরটা এলোপাথাড়ি কেঁপে উঠল বিশুর। একই সঙ্গে তীব্র একটা দুঃখ এবং সুখকেও টের পেল। সে মৃদু স্বরে বলল, কী সব বলছেন।

একটু ভারী গলায় জগন্নাথ উত্তর দিল, 'ঠিকই বলছি। আমি ভীষণ টায়ার্ড।'

'একমাসের মধ্যেই!'

'একমাস!' জগন্নাথ যেন থমকে গেল, 'আমার তো মনে হচ্ছে দশ বছর কেটে গেল।'

বিশু শান্ত গলায় বলার চেষ্টা করল, 'আপনার মন আজ ভাল নেই।'

মাথা নাড়ল জগন্নাথ, 'মন ঠিক আছে। আমি ভেবেই বলছি।'

রাস্তার মোড়ের কাছে এসে বিশু দাঁড়াল, বলল—'আমি শিয়ালদার দিকে যাবো।'

ক্লান্ত হাসি হাসল জগন্নাথ, 'আচ্ছা। আবার দেখা হবে।'

তারপর আর ফিরেও তাকাল না।

একা হতেই নিজের কাছে ধরা পড়ল বিশু। স্পষ্টই সে বুঝতে পারল তার মন ভারমুক্ত, সে সুখ বোধ করছে। হয়তো বা এই সুখ অবৈধ। পরশ্রীকাতরতা থেকেই এরকম সুখ আসে।

আবার একটু দুঃখও বোধ করছিল বিশু জগন্নাথের জন্য। কিন্তু সে দুঃখটুকু তার মনের ভদ্রতাবোধ। তার বেশী কিছু নয়।

অন্য মনে শিয়ালদায় এসে রাণাঘাটের ট্রেন ধরল সে।

রাত্রে মস্ত চাঁদ উঠেছিল। মেঠো গ্রাম্য পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল বিশু। একটা ছোট্ট ঝিল-এর ধার দিয়ে রাস্তা বেঁকে গেছে। একটু দাঁড়িয়ে বিশু সিগারেটে ধরিয়ে নিচ্ছিল। জলে চিকমিক করে কাঁপছে জ্যোৎস্না। জলের ওধারে একটা খুটি, হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা মানুষ ঝুঁকে জলে নিজের ছায়া দেখছে। বিশুর মন বলছিল জগন্নাথের সঙ্গে বনলতার এ বিয়ে টিঁকবে না। ভাবতেই বুকের মধ্য দিয়ে তীব্র একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। তারপর কী হবে ভাবলই না।

গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে সে তার পোলট্রির পোষা হাঁস মুর্গী আর জলার মাছগুলির কাছে ফিরে যাচ্ছিল।

॥ সাত ॥

আসলে নিজেকে বন্দিণীর মতোই লাগে বনলতার। যদিও তার এ বিয়ে ভালবাসার, স্বেচ্ছার, তবু ভেবে দেখলে সঠিক স্বয়ম্বরাও তো সে হয়নি। জগন্নাথ তাকে ক্ষ্যাপার মতো ভালবেসেছিল, আর সেই ভালবাসাই বনলতার বিচার-বুদ্ধিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার বয়স কম, বুদ্ধি কম, কারো পরামর্শ নেওয়ার কথা তার মনেই হয়নি। দু একজন বান্ধবীকে বলেছিল তার ভালবাসার কথা, তারা খুব উৎসাহ দিয়ে 'ইস্, কী ভালো হবে' বলে তাকে উস্কে দিল। ওদেরও দোষ নেই, ওরাও বয়সের বুদ্ধিতে চলে। কিন্তু বিয়ের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই বনলতা এখন টের পাচ্ছে—ভুল হয়ে গেল।

সারাদিন একা একা শহরতলীর এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটাকে তার প্রকাণ্ড বলে মনে হয়। সে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায়, একা। বিষণ্ণ বোধগুলি তার অল্প বয়সকে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দেয়। অথচ কোথায় ভুল হল তার সঠিক কারণটাকে সে কিছুতেই ছুঁতে পারে না। কিন্তু কেবল মনে হয়—ভুল, বড় বেশী ভুল হয়ে গেছে। বাবা, সারা পৃথিবীতে তার আত্মীয় বলতে একমাত্র বাবা, তাঁকে না জানিয়ে পালিয়ে বিয়ের জন্য যত কাণ্ড সে করল, সেই সব কাণ্ডকে এখন বড় হাস্যকর ছেলেমানুষী বলে মনে হয়। ছেলেবেলা থেকেই বিয়ে বলতে সে বোঝে শানাইয়ের আওয়াজ, সিঁথিমৌর, বেনারসী, ম্যারাপ, আলো, স্ত্রী আচার। তার বিয়েতে কিছুই হ'ল না, কাগজে সই করা আর হোটেলের পার্টিতে কিছু বন্ধু বান্ধবীর আগমন। কেউ জানলই না। অথচ অনুষ্ঠানহীন ভাবে সে জগন্নাথের বৌ হয়ে গেল। হয়ে গেল? নাকি হয়েও হল না?

হ্যাঁ বাইরে থেকে দেখলে সে জগন্নাথের বৌ। কিন্তু ভিতরে, মনের মধ্যে সে একা বনলতা। জেদী একগুঁয়ে, আদুরে বনলতা।

সেখানে স্বামী বলে সে জগন্নাথকে মানে না।

জগন্নাথ লোক খারাপ নয়। বরং ভালোই। বয়সে বনলতার চেয়ে বছর আটেকের বড়, ভাল কলেজের অধ্যাপক, এম এ ডি ফিল। বিয়ের পর চেহারাটা চর্বি জমে একটু ভরভরাট হয়েছে। ভালই দেখায় জগন্নাথকে, যখন সে ঘি রঙের সিল্কের পাঞ্জাবী পরে কলেজে যায়। ধীর স্থির লোক একটু অন্যমনস্ক, কুনো আর খুবই ভাবপ্রবণ। মেয়েরা এমন ছেলেকে সহজেই দখল করতে চায়। এমন কি বনলতার একজন প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল। নীতা। মুখে তেমন কিছু বলত না জগন্নাথ, কিন্তু কখনো বিরক্তের সঙ্গে নীতার হ্যাংলাপনার উল্লেখ করে বলত মেয়েটা যাচ্ছেতাই! দেখ আবার চিঠি দিয়েছে। বলে চিঠি দেখাতো বনলতাকে। বনলতা কৌতূহল নিয়ে পড়ত। খুব খারাপ কথা অনায়াসে লিখত নীতা, আর বার বার জগন্নাথের মহানুভবতা, উদারতা ইত্যাদির উল্লেখ করে তাকে গ্রহণ করতে সাধাসাধি করত। সরল জগন্নাথ আত্মরক্ষার জন্য বনলতার কাছে জমা দিত চিঠি। বলত—তুমিই উত্তর দিয়ে দিও।

উত্তর দেয়নি বনলতা, তবে তার রেজিস্ট্রেশনের পর দিন মেয়েটিকে এক লাইনে খবরটা জানিয়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা খুবই নিষ্ঠুর হয়েছিল। খবরটা দেওয়ার সময়ে নিজের ভিতরে বনলতা সেই নিষ্ঠুরতার আনন্দকেও টের পেয়েছিল। নীতা নামে সেই অচেনা মেয়েটিকে এখনো মাঝে মাঝে ভাববার চেষ্টা করে সে। জগন্নাথ বলে-ছিল, নীতা দেখতে সুন্দর নয়, তার রঙ কালো, সামনের দাঁত সামান্য বড়, স্বাস্থ্য ভাল—সব মিলিয়ে খুবই সাধারণ মেয়ে। তবে নীতার চোখ নাকি সুন্দর। বনলতা জানত তার আগুন চেহারার কাছে নীতা কিছুই না। তবু বিয়ের আগে সে নীতার কথা ভেবে কখনো কখনো অস্বস্তি বোধ করেছে—নীতার চোখ—সে কি খুবই সুন্দর? বাজে মেয়েদের ভাল চোখ থাকলেই কি।

মাঝে মাঝে নীতা জগন্নাথের কলেজের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে

অপেক্ষা করে করে পাকড়াও করত জগন্নাথকে। বড় বিপদে পড়ত জগন্নাথ। বনলতার কাছে এসে বলত বড় ভয় করে। মেয়েটা বেহেড হয়ে যদি একদিন হাতফাত ধরে চেঁচামেচি শুরু করে! আজকেও বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছিল। কখনো কখনো সিনেমার টিকিট নিয়ে আসে, রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতে চায়। কী যে কাণ্ড করে! ও বোধহয় ক্ষেপে গেছে। এ সব শুনে বনলতার ভিতরটা দপ্ করে জ্বলে উঠতো। নীতা নামে সেই অচেনা মেয়েটিই পরোক্ষভাবে জগন্নাথের প্রতি তার যুক্তিহীন আকর্ষণ তৈরী করছিল। জগন্নাথকে কে একটি মেয়ে পাওয়ার জন্য ক্ষেপে গেছে—এই চিন্তাই তাকে অস্থির রাখত। তার ভিতরে রেষারেষির ভাব এনে দিত। নইলে সাদা চোখে জগন্নাথকে বিচার করে দেখতে পারত বনলতা। না, জগন্নাথের মধ্যে বিমুখ হওয়ার মতো কিছু নেই, তবু বনলতা জানে যে বিমুখ না হওয়াই ভালবাসা নয়। অচেনা নীতার সঙ্গে পাল্লা না দিলে সে বুঝতে পারত নিজের অন্তরকে। আর একটু অপেক্ষা করতে পারত।

নীতা হেরেই গেছে। কিন্তু সেই হারিয়ে দেওয়ার আনন্দটা বড় ক্ষণস্থায়ী হয়েছে বনলতার মনে। এখন নীতার কথা মনে হলে আর তেমন ক্ষ্যাপাটে উত্তেজনা বোধ করে না সে। বরং মনে হয়—আহা নীতা হয়তো কত কেঁদেছিল। নিষ্ফল আক্রোশে হয়তো কত অভিশাপ দিয়েছে তাকে। সেই সব অভিশাপ ফলে যাচ্ছে কিনা কে জানে। কৈ, এত কাণ্ড করে সে যার বৌ হল, তাকে পেয়ে খুব একটা কিছু পেয়েছে বলে তার মনে হচ্ছে না তো। বরং মনে হচ্ছে জগন্নাথ অন্য কারো স্বামী হলে তার দুঃখের কিছুই থাকতো না। নীতা কি এখনো জগন্নাথের কথা ভাবে? কে জানে!

বিশু এসেছিল কয়েকদিন আগে। সেই আত্মীয়হীন বিশু, সে তাদের বাড়িতে তার ভাইয়ের মতোই বেড়ে উঠেছিল। বেপরোয়া সাহসী, সদা হাস্যমুখ বিশু খুঁজে খুঁজে কোথা থেকে তার ঠিকানা

বের করেছিল। জিজ্ঞেস করায় বলেছিল—লোক লাগিয়েছিলুম। সে তোর হাজব্যাণ্ডকে কলেজ থেকে বাসা পর্যন্ত ফলো করেছিল। শুনে চমকে উঠেছিল বনলতা—ও মা! কিন্তু সে জানে যে বিশু সব পারে। হাসিমুখে কথা বলল বিশু, বাবার কথা, বাসার কথা, বলে গেল বনলতা জগন্নাথকে বিয়ে করে ঠিকই করেছে। কিন্তু বিশুর চোখ সে কথা বলছিল না। বনলতা বুঝেছিল বিশু খুশী হয়নি। ও ঠিক খুঁজে খুঁজে জগন্নাথের কাছেও যাবে। আলাপ জমাবে। বিশুর মান অপমান বোধ নেই। অহংকারী জগন্নাথ বিশুকে পছন্দ করবে কি না কে জানে! জগন্নাথ অচেনা লোক দেখলে কখনো খুব খুশী হয় না। আত্মমগ্ন থাকতেই সে ভালবাসে।

বিশুর কথা, বাবার কথা মনে পড়ছিল বনলতার। বিশু রাণাঘাটের কাছে পোল্‌ট্রি করেছে, হাঁস মুর্গী নিয়ে মেতে থাকে। বলল একদিন নিয়ে যাবে। কিন্তু কোনোদিনই বোধহয় সেই নিয়ে যাওয়াটা আর হবে না বিশুর। বাবার স্ট্রোক হয়েছিল। বনলতার বিয়ের কয়েকদিন পরেই। ওইরকম সুন্দর স্বাস্থ্য বাবার, আর ওইরকম স্থির শক্ত লোক। বনলতা শুনেছে সে পালিয়ে আসার পরদিনও বাবা অফিসে গেছে। বাইরে একটুও চঞ্চল দেখায় নি তাকে। কিন্তু তার কয়েকদিন পরেই তার স্ট্রোক হয়। হয়তো এই বয়সে শোক-দুঃখ চেপে রাখতে নেই। রাখা যায়ও না। কিন্তু বাবার সঙ্গে কোনো মিটমাটই আর হবে না কোনোদিন।

বনলতা জানে বাবা কেমন। মরে গেলেও দুর্বল হয় না লোকটা। কিন্তু বনলতা মনে মনে মরে যাচ্ছে বাবার জন্য। এক একবার ইচ্ছে হয় পালিয়ে গিয়ে বাবাকে দেখে আসে, কিংবা টেলিফোন করে গলার স্বর একবার শুনে নেয়। কিন্তু সাহস হয় না। ভালবাসা—হায় এক সন্দেহজনক ভালবাসার জন্য তার সর্বস্ব চলে গেছে। বাবা ছিল একরকমের সঙ্গী, জগন্নাথ আর একরককের। বাবা কথা বলত কম, কিন্তু হাবে ভাবে ফুটে উঠত মায়া, কোমলতা।

কাছে গিয়ে বসলে বরাবর মনে হয়েছে যেন সে এক বিশাল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। রুটীন বাঁধা চলাফেরা বাবার, কখনো বেচাল হয়না। পুরুষমানুষ কেমন হয় তা সে বাবাকে দেখে চিনেছে। জগন্নাথ অন্যরকমের সঙ্গী। কিন্তু তবু বনলতার মনে হয় বাবার মতো কিছু কিছু গুণ জগন্নাথের থাকলে বড় ভাল হত। কখনো জগন্নাথকে তার নিজের চেয়ে বড়, শ্রেষ্ঠ বা উচ্চতর কিছু বলে মনে হয় না। বরং মনে হয় জগন্নাথ তার সমান সমান। এই সমান হওয়ার ভাবটা বনলতার কখনো ভাল লাগে না। কোনো মেয়ের লাগে কিনা কে জানে ?

দুপুরে রান্নাঘরে বসে একা একা ভাত খাচ্ছিল বনলতা। সকালের রাঁধা ভাত, জগন্নাথ খেয়ে গেছে, সেই ভাত সারাদিনে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গলা দিয়ে নামছিল না। কয়েক গ্রাস খেয়ে থালা সরিয়ে রাখল। শুধু শুধু মাছ খেল একটু। ভাল লাগল না! কাঁচা লঙ্কায় কামড় দিল, নুন মুখে দিয়ে শিষ্ তুলতে লাগল। বেলা গড়িয়ে গেছে অনেক। বোধহয় দেড়টা। এত বেলায় সে কোনোদিন খায় না। কোনোদিন জলটাও গড়িয়ে খায়নি বনলতা, আর এখন রান্না করতে হয়, জগন্নাথকে ভাত বেড়ে দিতে হয়। নিজে বেড়ে খেতে তার ভাল লাগে না। একা একা দুপুরে ভাতের থালার সামনে বসে তার রোজ কান্না আসে। নুন মুখে দিয়ে লঙ্কা কামড়ে সে উদাসভাবে দেখল বাদামী রঙের বেড়ালটা তার মাছের বাকী অংশে মুখ দিয়েছে। থালার কানায় হাত চেঁচে নিয়ে সে চুপ করে তাকিয়ে রইল। দেয়ালে টিকটিকি ঘুরছে, মিটসেফের তলা থেকে একটা ইঁদুর দৌড়ে বেরিয়ে উনুনের পিছনে চলে গেল। শূন্য মনে চেয়ে রইল বনলতা। বেড়ালটা সমস্ত শরীরে ঢেউ তুলে মাছ খেতে খেতে তার দিকে চেয়ে দেখল। বনলতা হেসে বলল—খা। তারপর এলোচুল মুঠোয় ধরে উঠে পড়ল।

আঁচিয়ে ঘরে এসে রেডিও খুলল সে। কীর্তন হচ্ছে। বন্ধ করে

দিল। ওপরের ফ্ল্যাটে কচি একটা বৌ থাকে। খুব পান খায় বৌটা। ঘরে পান নেই। ইচ্ছে হচ্ছিল একটা পান খেয়ে আসতে। একটু গল্পও করে আসা যেত। কয়েকদিন এরকম ভাবেই আলাপ হয়েছে বৌটার সঙ্গে। বিধবা শাশুরির শাসনে থাকে, কাজ করে, ডবলু বি সি এস স্বামীর জন্য গর্বে বুক ফুলে থাকে তার। বনলতার ভালই লাগে।

দরজা খুলে সিঁড়ির গোড়ায় এসে বনলতা ডাকল—অনিমা, ও অনিমা। সাড়া পাওয়া গেল না। হয়তো খাওয়ার পর দুপুরের ঘুমে ঢলে আছে। তাই আর ডাকল না বনলতা। আবার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। শরৎকাল শেষ হয়ে এসেছে। বাতাসে শীতের আমেজ! মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে একটা বালিশ টেনে শুয়ে পড়ল বনলতা। নানারকম হিজিবিজি চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল তার মাথা। মাঝে মাঝে কৌশিক ব্যানার্জির মুখটা তার মনে পড়ে। কিছুদিন আগে কাগজে কৌশিকের ছবি বেরিয়েছিল—বিলেত যাত্রী কৌশিক। বাবার খুব পছন্দ ছিল কৌশিককে। জাতে, গোত্রে, কোষ্ঠিতে মিল, তাছাড়াও ছেলেদের ঘর উঁচু, বাবার বিচারে এইগুলোই বড়। বাবা নিজে আজো ব্রাহ্মণের মতোই আচার আচরণ মেনে চলেন। তাঁর পৈতা কখনো ময়লা হয়না। বনলতা সব রকম আচার আচরণই শিখেছিল। কাজে লাগল না। ব্রাহ্মণের ঘর থেকে সে এসেছে বোসের ঘরে। জগন্নাথ বসু তার স্বামী—এটা ভাবতে তার ভাল লাগে না। ছেলেবেলার কী একটা সংস্কারে যেন ঘা লাগে। এ বিয়েকে বলে প্রতিলোম। সে জানে জগন্নাথ এসব বোঝে না। সে গোঁড়া অবিশ্বাসী। তবু তার বাড়িতেও এই বিয়ে নিয়ে হৈ চৈ হয়েছে। বামুনের মেয়েকে ছেলের বৌ হিসেবে ঘরে তোলেননি জগন্নাথের বাবা মা। তাই তারা আলাদা হয়ে রইল। হয়তো বরাবর এরকমই থাকতে হবে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল বনলতা। ঘুম ভেঙে দেখল

বেলা ফুরিয়ে এসেছে। কড়া নেড়ে ঝি ডাকছে। উঠে দরজা খুলে দিল সে। তারপর শাড়ি গুছিয়ে এলো চুল খোপায় বেঁধে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শহরতলীর নির্জন রাস্তাঘাট, ফাঁকা জমি পড়ে রয়েছে অনেক। রাস্তার ওপাশে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে ছিল। খেয়াল করেনি বড় রাস্তা থেকে নেমে সোজা তার দিকেই হেঁটে আসছে একটি মেয়ে। কাছাকাছি এসে মেয়েটি ছোট্ট একটু কাগজে লেখা ঠিকানার সঙ্গে বাড়ির নম্বর মেলাতে তাকে জিজ্ঞেস করল—জগন্নাথ বোস কি এখানে থাকেন? মাথা নাড়ল বনলতা—এই বাড়িই। মেয়েটি হাসল—উনি বাড়িতে নেই, না? বনলতা কথা না বলে আবার মাথা নাড়ে—না। মেয়েটিকে বেশ দেখতে। কালোর ওপর ছিপছিপে শরীর। লম্বাটে মুখ, টানা সুন্দর চোখ, হয়তো ওর বোন টোন কেউ হবে। বনলতা এবার জিজ্ঞেস করল—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—অনেক দূর। সেই শিবপুর থেকে। আপনি বনলতা, না?

—হ্যাঁ। হাসল বনলতা—আপনি কে?

—আমি নীতা গুহ, বলে একটু চুপ করে থেকে বলল—আমার কথা আপনার মনে না থাকারই কথা। আমাকে আপনি দেখেননি।

বনলতা মনে মনে চমকে উঠলেও বাইরে স্থির ছিল। মেয়েটাকে যথেষ্ট ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বাসে ট্রামে এসেছে নিশ্চয়ই। দু'তিনবার বদল করে আসতে হয়েছে বোধ হয়! তবু এত কষ্ট করে কেন এসেছে মেয়েটা কে জানে! নীতাকে দেখে তার মনের ভিতরটা কিন্তু শক্ত হয় না। সামান্য হিংসের ভাবও এল না মনে। সে হেসে বলল—আপনার কথা শুনেছি ওঁর কাছে। আসুন ভাই, ভিতরে আসুন।

তার এ কথায় মেয়েটির মুখ আলোময় হয়ে গেল। যেন আশা করেনি এত ভাল ব্যবহার পাবে। বনলতার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল—আপনি সত্যিই ভীষণ সুন্দর!

—খুব ভীষণ? হাসল বনলতা।

—খুব যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশী।

মেয়েটিকে চৌকীর ওপর বিছানায় বসিয়ে মেঝের মাদুর-টাদুর তুলল বনলতা, বলল—নতুন সংসার তাই একটু অগাছালো।

মেয়েটির চোখ আঠার মতো আটকে আছে তার মুখে। বসবার ভঙ্গীর মধ্যে জড়োসড়ো একটা ভয়ের ভাব, মুখে একটু অপ্রতিভ হাসির আভাস। বনলতা লক্ষ্য করে মনে মনে হাসল। কে জানে হয়তো নিজের সঙ্গে বনলতাকে মিলিয়ে দেখতে এসেছে মেয়েটা। তার মনে পড়ল আজকে একটু আগেই সে মেয়েটার কথাই ভাবছিল। চিঠি পড়ে মেয়েটাকে যেমন নির্লজ্জ বেহায়া উগ্র স্বভাবের বলে মনে হয়েছিল, মুখোমুখি একেবারেই সেরকম মনে হল না। বরং লাজুক ভীরু, শান্ত স্বভাবের সাধারণ একটি মেয়ে। একটা মানুষ সম্বন্ধে আর একটা মানুষ কত সময়েই কত ভুল ধারণা করে রাখে।

ঝিকে চায়ের জল চড়াতে বলে বনলতা মেয়েটির মুখোমুখি একটা মোড়া টেনে বসল, বলল—বলুন ভাই, আপনার কথা, একটু শুনি।

বাচ্চা মেয়ের মতো লজ্জার হাসি হাসল মেয়েটি। কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপে ঝোলানো ভ্যানিটি ব্যাগটা নামিয়ে রাখল বিছানায়, তারপর একটু ইতস্ততঃ করে ব্যাগটা খুলে একটা রূপোর গয়না বের করল। খোপায় গোজার কাঁটা, তাতে সুন্দর বড় একটা মিনে করা প্রজাপতি। হেসে বলল—আপনার জন্য এনেছি।

—ও মা! কেন?

আবার লাজুক হাসি—কিছু একটু দিতে ইচ্ছে করছিল। গত কাল নিউমার্কেটে ঘুরে ঘুরে এটা কিনে আনলাম।

মনে মনে খুশী হল বনলতা—কেন কষ্ট করতে গেলেন ভাই! বাঃ, জিনিসটা কিন্তু খুব সুন্দর—আমি আপনার চুল বেঁধে পরিয়ে দিয়ে যাব।

—বেশ। আগে চা-টা খেয়ে নিন।

মেয়েটি নীরবে ঘাড় নাড়ল। মুখে সেই লাজুক হাসিটি লেগে

আছে। কিন্তু একটু উৎসাহ পেলে বোধহয় অনেক কথা বলতে পারে। বনলতার মধ্যে আপনা থেকেই একটা দিদি দিদি ভাব এল। বয়স অল্পই বোধ হয়, আঠারো-উনিশ। মুখে চোখে এখনো সংসারের ছাপ পড়েনি। চোখ দেখে মনে হয় ঐ চোখে এখনো স্বপ্নের বাসা। বনলতা তার নিজের বুকে একটু দুঃখের ব্যাথা টের পেল। আড়াল থেকে সে বড় নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা করেছে মেয়েটি সঙ্গে। এখন মুখোমুখি তার মায়া হচ্ছে। ইচ্ছে করছে ওর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জিনিস আবার ওকে ফিরিয়ে দেয়।

ঘরের চারদিকে ডাগর চোখে চেয়ে দেখল নীতা। চাউনীতে পিপাসা ধরা পড়ে। বলল—কী সুন্দর সাজিয়েছেন সব। অথচ বলছিলেন সব অগোছালো।

—এখনো তো সাজান হয় নি।

নীতা প্রতিবাদ না করে মিষ্টি হাসল, বলল—আমাদের বাড়িতে এত সব জিনিস নেই।

বনলতা বুঝল সে যেটাকে অগোছালো বলছে সেটা অন্য অবস্থার মানুষের কাছে অগোছালো মনে নাও হতে পারে। বিয়ের পর জগন্নাথ টুক-টাক করে অনেক জিনিষ এনেছে। আয়না বসানো লোহার আলমারি, সোফা কাম বেড, কিস্তিতে কেনা ফ্রিজডেয়ার, ঘর সাজানোর জন্য প্ল্যাস্টারের তৈরী কয়েকটা ছবি, জানলা দরজায় হাল ফ্যাসানের কাঠের ফ্রেমে পর্দা। এত সব অনেকের ঘরেই থাকে না। বোধহয় বনলতা বড় ঘরের মেয়ে বলেই তাকে খুশী করার জন্য প্রাণপাত করে এত সব করেছে জগন্নাথ। যা ব'লে তাই এনে দেয়। বনলতার বাড়িতে এর চেয়ে ঢের বেশী জিনিস ছিল। তাই এত সব তার চোখেও পড়ে না। কিন্তু আজ এখন নীতা বলাতে তার চোখে পড়ল—সত্যিই, কিছু কম সাজানো হয়নি। সে চোখ সরিয়ে নীতাকে আবার দেখল। যথাসাধ্য সেজেছে নীতা, তবু স্পষ্ট বোঝা যায় ও গরীবের সংসার থেকে এসেছে। দুখানা হাতে সংসারের নানা

কাজের ছাপ। বনলতার মনে হল জগন্নাথকে বিয়ে করে সে উঁচু থেকে কয়েক ধাপ নিচে নেমে এসেছে। কিন্তু নীতা যদি পারত জগন্নাথকে বিয়ে করতে তবে নীতা বরং কয়েক ধাপ উঁচুতে উঠে আসতে পারতো। সেইটেই সুন্দর হত। ভাল হত।

ঝি এসে বলল—চায়ের জল হয়ে গেছে দিদিমণি।

বনলতা নীতাকে বলল—আসছি ভাই চা-টা নিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল নীতা আপনি একা যাবেন কেন। চলুন আমিও যাচ্ছি।

হাসল বনলতা—আসবে? এসো। বলেই জিব্ কাটল—এ মা, তুমি বলে ফেললাম।

—বেশ করেছেন। আপনি দিদি না?

—তাই বুঝি! মনে মনে খুশী হল বনলতা। তার মনে দিদি-দিদি ভাব এসে গিয়েছিল, চালাক মেয়েটি সেটা বুঝে গেছে।

রান্নাঘরে এসে নীতা বলল—চা—টা আমিই করি।

—করো। বলে বনলতা চা চিনি দুধ গুছিয়ে দিয়ে বলল—সাগুর পাপড় আছে খাবে?

—খেতে ইচ্ছে করছে না।

—একটু খাও। ভাল ঘিয়ে ভেজে দেবো।

মুখোমুখি বসে বনলতা দেখছিল কত নিপুণ হাতে মেয়েটি চা করল। বনলতা নিজেই কড়াইতে ঘি ঢেলে পাঁপড় ভাজতে যাচ্ছিল, মেয়েটি তার হাত থেকে খুন্তি কেড়ে নিয়ে নিজেই ভাজল। বলল আপনার যে রান্নাবান্নার অভ্যেস নেই তা আমি জানি। আমাকে বাড়িতে সব কাজ করতে হয়।

—আমার অভ্যেস নেই কি করে বুঝলে?

—আপনি যা সুন্দর!

—কাজ না করলেই বুঝি সুন্দর হয়!

—তা নয়। মেয়েটি বিপদে পড়ে বাধো বাধো গলায় বলল—

আপনাকে কাজকর্ম মানায় না। এত সুন্দর মানুষ কাজ করবে কেন?

বনলতা খুব হাসল। অনেক দিন পর তার মনটা হাল্কা লাগছে আজ। বলল—দাঁড়াও, জগন্নাথকে সব বলে দেবো আজ।

মেয়েটি এক পলকে থমকে গিয়ে বলল—আপনি ওঁকে নাম ধরে বলেন?

বনলতা দেখল জগন্নাথের নামে মেয়েটির চোখে শ্রদ্ধার ভাব। এ মেয়ে বিয়ে না হলেও জীবনে জগন্নাথকে বোধ হয় নাম ধরে বলবে না। বনলতা বলল—পতির নামে গতি হয়। জানো না? আমি সামনা সামনি ওকে জগন্নাথ বলি! যা বিচ্ছিরি নাম···

নীতা মাথা নিচু করে হাসল। বনলতা লক্ষ্য করে ওর শ্যামলা রঙের মুখমণ্ডলে রক্ত এসে ভীড় করল। হাতের চায়ের কাপ চলকে গেল! আহা রে! মনে মনে বলল বনলতা।

চায়ের পর তার চুল নিয়ে পড়ল নীতা। চুলের গোছ হাতে ধরেই বলল—ইস্, ভগবান আপনাকে সব দিক দিয়ে দিয়েছেন। অনেকে সুন্দর মেয়েরই চুল থাকে না, আপনার তাও আছে অঢেল।

—নজর দিওনা ভাই। বনলতা মুখটিপে হাসল।

—আমার চোখে বিষ নেই। সুন্দর দেখলে আমার বড় ভাল লাগে।

বনলতা সে প্রসঙ্গে না গিয়ে বলল—ভগবান আমাকে আর কি কি দিয়েছেন বল তো!

একটু চুপ করে থেকে নীতা বলল—সবই তো দিয়েছেন! যেমন চেয়েছিলেন।

—যেমন চেয়েছিলাম? গলাটা হঠাৎ থমথমে হয়ে আসছিল। হেসে সামলে নিল বনলতা।

একটু চুপ করে থেকে বনলতা বলল—জানো তো, অতি বড় সুন্দরী না পায়······

নীতা অকুল হয়ে বলল—যাঃ। আপনি ঐ শ্লোকটা বলবেন না।

আপনাকে মানায় না।

—ইস্, নীতা, তুমি যে কোনোখানেই আমাকে মানাতে পারছ না!

নীতার মুখ পিছনে। বনলতা দেখতে পাচ্ছে না। শুধু অনুভব করছে তার চুলের গোড়ায় একটুও ব্যাথা না দিয়ে চমৎকার চুল বাঁধছে নীতা। বেশ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নীতা বলল—আপনি তো বর পেয়েছেন।

বনলতা চুপ করে রইল। একবার ইচ্ছে হচ্ছিল মাথা ঘুরিয়ে নীতার মুখখানা দেখে। কিন্তু ওর গলার স্বর একটু কেমন শোনালো যেন। হয়তো ওর চোখে তখন জল। তাই বনলতা মুখ ঘোরাল না। নীতা যদি আড়ালে একটু কাঁদে, তবে কাঁদুক। বনলতা চুপ করে রইল।

চুল বেঁধে সেই প্রজাপতি কাঁটা খানা গুঁজে দিয়ে নীতা বলল—ব্যাস্, এবার আপনি সিঁদুর পরুন।

—তুমিই পরিয়ে দাও।

—যাঃ কুমারী মেয়েরা পরায় না।

বনলতা হাসল।

আয়নার সামনে বসে সিঁদুর পরছিল বনলতা। হঠাৎ নিজের সুন্দর প্রতিবিম্বের পিছনে নীতার মুখখানা চোখে পড়ল। মগ্ন হয়ে চেয়ে আছে। খেয়ালই নেই যে আয়নায় ওর মুখ বনলতার চোখে পড়তে পারে। হাসি সামলে চোখ সরিয়ে নিল বনলতা। ভেবে দেখল—কত সুন্দর হত যদি আজ এ সময়ে এইখানে বসে একা একা নীতা এই সিঁদুর পরত! বনলতা অভ্যাস বশতঃ সিঁদুর পরে, দায় সেরে যায় মাত্র। কিন্তু নীতা হলে কত অহংকার আর যত্ন নিয়ে পরত! কত ভালবাসায়, মায়ায়, বিশ্বাসে! বনলতারই দোষ। সে জোর করে নীতার ঘরে ঢুকে বসে আছে। এ দখল করা মাত্র, পাওয়া তো নয়! কিন্তু

নীতা হলে…হায়! নীতা হলে…

ইচ্ছে করে নীতাকে ডেকে বলে—এসো তোমাকে বৌ সাজিয়ে দিই। তুমি সেজেগুজে বৌ হয়ে বসে থাকো। এ ঘর সংসার তোমাকেই মানায়, যেহেতু ভালবাসো। এসো, তোমাকে সাজিয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি। জগন্নাথ তোমাকে দেখে চমকে যাবে, হয়তো গোলমাল করবে, তারপর আস্তে আস্তে বুঝবে তুমিই ওর ঠিক বৌ…এসো, নীতা…

নীতা বলল—ইস্, কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে!

হাসল বনলতা—তোমার হাতের গুণ। যা সুন্দর খোঁপা বেঁধেছো।

সেটাও আবার চুলের গুণ। নীতা লাজুক মুখে বলল। তারপর ঘরি দেখে উঠবার উপক্রম করে বলল—এবার কিন্তু আমাকে যেতে হবে।

—ওমা! ওর সঙ্গে দেখা করে যাবে না। ও তো একটু পরেই আসবে। এতক্ষণে এসে পড়বারই তো কথা! কেন যে দেরী করছে।

নীতা মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলল—আজ শুক্রবার, ওঁর বোধহয় আজ নাইট শিফ্‌টে ক্লাশ আছে!

—ঠিক তো। বনলতা হাসে—আমি ভাই ওসব রুটিন টুটিন রাখতে পারি না। তুমি আর একটু বোসো না। এসে যাবে।

নীতা মৃদু গলায় বলে—আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলুম, উনি থাকলে আপনার সঙ্গে এমন ভালভাবে দেখা করতেই পারতুম না। তা ছাড়া, অনেক দূরে যাব। আজ আসি।

—যাবে?

—হুঁ।

—যাবে কেন? থাকো না। বলেই আত্মবিস্মৃত বনলতা হঠাৎ চমকে উঠল। সামলে নিয়ে বলল—আমি যে একা থাকবো!

ওঁর ফিরতে অনেক দেরী হবে। বোধহয় সোয়া আটটায় ক্লাশ

শেষ হবে। ততক্ষণ থাকতে গেলে…

বনলতা হাসল। বলতে পারল না যে জগন্নাথ ফিরে এলেও সে একাই থাকবে। এটা অন্যরকমের একাকীত্ব। নীতা এটা বুঝবে না। এটা খুবই স্পষ্ট যে নীতা জগন্নাথকে পাগলের মতো ভালবাসে। এই ঘরে, সংসারে নীতা কখনো কোনাদিনই একা বোধ করত না। নীতা কী করে বুঝবে বনলতা কেন একা!

—আচ্ছা ভাই, এসো। আবার আসতে হবে কিন্তু!

—আসবো। বলে কাঁধের ব্যাগ তুলে নিল নীতা।

সদর পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল বনলতা। সামনে খোলা জমি, তারপরে বড় রাস্তা। মৃদু কুয়াশা আর অন্ধকারে ঢাকা। নীতা পিছনে মুখ ফিরিয়ে হাসল, তারপর সেই রহস্যময় আলো আঁধারির মধ্যে তার আবছা ছায়া মিলিয়ে গেল।

বনলতা দরজা বন্ধ করে শূন্য ঘরটার দিকে চেয়ে দেখল। এ যেন তার নিজের ঘর নয়। অন্য কার ঘরে ঢুকে সে বসে আছে।

॥ আট ॥

অরিজিতের বাড়িটা জগন্নাথ ভুলেই গেছে। আমহার্স্ট্ স্ট্রীট দিয়ে উত্তরমুখো গেলে বাঁ হাতে একটা গলির মধ্যে অরিজিতের বাড়িটা। সেখানে একটা সময়ে জগন্নাথ অনেকবার গেছে। তখনো অরিজিৎ বাউণ্ডুলে হয়ে যায় নি, তখনো তাকে ডাকেনি প্রবাস। সেটা প্রায় ছেলেবেলাই বলা যায়। কৈশোর যৌবনের সন্ধি-সময়। আজকের বাঁধা বাঁউণ্ডুলে অরিজিৎকে দেখে সেই কিশোর যুবাকে কল্পনা করা কঠিন। হুটি কল্পনাময় চোখ ছিল তার। কবিতা লিখত, নরম নরম হাত পা, লাজুক মুখভাব। বড্ড ঘরকুনো আর মায়ের আঁচলধরা ছেলে। সে কখনো মোহনবাগানের খেলা, কাবুলিদের নাচ কিংবা দমকলের দুর্গাপূজো দেখতে যায় নি! অরিজিৎদের বাড়ির ভিতরের বারান্দায় ছিল পাখীর খাঁচা সারি সারি, ছিল রঙীন মাছের কাচ-বাক্স, ব্যাগাটোল, ক্যারম, গল্পের বই। অরিজিৎ ঘরেই থাকত। কলেজে পড়তে পড়তেই সে একটা বাজে মেয়ের প্রেমে পড়ে। কলেজের একটা ছেলেমানুষী একজিবিশন, তাতে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীতে সেই মেয়েটি ভ্যানিশিং ক্রিম তৈরী করে দেখিয়েছিল। স্মার্ট মেয়ে, মুখচোখও ভাল, কিন্তু দুঃখের বিষয় মেয়েটিও তার নিজের বিষয়ে জানত। অরিজিৎ প্রদর্শনীর চারদিনই সেই ভ্যানিশিং দেখতে গিয়েছিল। তারপর প্রায় পাগল হয়ে গেল মেয়েটির জন্য। সকালে মেয়েদের কলেজ, দুপুরে ছেলেদের। অরিজিৎ সকালের কলেজে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত, দুপুরের ক্লাশ ফাঁকি দিত। এইটুকু জানত জগন্নাথ। তারপর কী হয়েছিল তা শোনা কথা। তবে, খুবই সাধারণ ব্যাপার। মেয়েটার অন্য মানুষ ছিল, অরিজিৎকে দুচার দিন নাচিয়ে, ওর পয়সায় সিনেমা দেখে, রেস্তোরাঁয় খেয়ে ওকে ছেড়ে দেয়। অরিজিৎ অনেকদিন ঠিক

যেন বিশ্বাসই করতে পারেনি যে মেয়েটা ওকে ঠকিয়েছে। কুনো ছেলে বাইরের ঘা খেলে প্রথমটায় যা হয়। কলেজের শেষ ক্লাশটায় উঠে অরিজিৎ তীব্র বিষাদরোগে আক্রান্ত হয়। কিছুদিন মেণ্টাল হোম্-এ ছিল। তারপর যখন বেরিয়ে এল তখন সে-এক উদাসী মানুষ। কথা কম, চিন্তা বেশী। ওর মা মারা যাওয়ার পর একা হল অরিজিৎ, বাধাবন্ধনের দিক থেকে স্বাধীন। জগন্নাথ যে-বার এম-এ পাশ করেছে তিন চারটে টিউশানী সম্বল করে সেবারই অরিজিৎ তার দোতলায় তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, সবাইকে জানিয়েই গিয়েছিল। মাস দুই ঘুরে ফিরে এল। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারল যথারীতি, সিনেমা-টিনেমাও দেখল। বলল —ট্রেনে বা বাসে ঘুরে লাভ নেই, ঘুরতে হয় তো পায়দল। এবার পায়ে হেঁটে বেরোচ্ছি, এনিবডি উইশ টু অ্যাকম্পানী? কেউ রাজী হয়নি। জগন্নাথের তখন জীবন সংগ্রামের শেষ পর্যায়। দারিদ্র্যের তলা থেকে সদ্য-এম-এতে ফাষ্ট ক্লাশ পাওয়ার সৌভাগ্যের চূড়ায় উঠেছে। আর নয়। এবার চাকরি, ভাল থাকা, দুবেলা পেটভরে খাওয়া। প্রথমে একটা স্কুলে, তিনমাস পর মফঃস্বল কলেজে, তার একবছর বাদে কলকাতার বড় কলেজে চলে এল জগন্নাথ। ততদিনে অরিজিৎ উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম পূব ভারতবর্ষ চষে ফেলেছে পায়ে হেঁটে। মাঝে মাঝে আসত, বলত তার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা। আবার একদিন বিদায় নিয়ে চলে যেত। প্রথমটায় হয় তো ঝোঁকের বশেই বেরিয়েছিল অরিজিৎ, কিন্তু পরে সেটাই তার পেশা হয়ে দাঁড়ায়, ক্রমে সেটা নেশার স্তর ছেড়ে অস্তিত্বের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। জগন্নাথ ততদিনে কয়েকটা ইনক্রিমেণ্ট, একটা পার্ট টাইম লেকচারারশীপ, স্কুলফাইন্যালের হেড একজামিনার হয়ে কিছু পয়সা করেছে। বনলতার সঙ্গে প্রেম সেরে একদা দুঃসাহস ভরে বনলতার ডাকসাইটে বাবার অমতে তাকে রেজিষ্ট্রী করেছে। আলাদা বাসায় সংসার পেতেছে। আর তখন অরিজিৎ হয়তো বা

হিমালয়ের গভীর খাঁজে পিঁপড়ের মতো বুকে হেঁটে চলেছে, চতুর্দিকে নির্জন তুষারপাত, সানুদেশে নদীর জন্ম, আকাশে দুর্যোগ।

সকলেরই বয়স হয়। অরিজিতের কি হয়নি? তবু অরিজিৎ শিকড় ছাড়েনি এতদিন। এবারই জগন্নাথ দেখল অরিজিতের মেক-আপ ধুয়ে গেছে, ছদ্মবেশের জীর্ণ ফাঁক ফোঁকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বুড়োটে ক্লান্ত মানুষটাকে। বড় কষ্ট হয় জগন্নাথের। সেদিন ওভাবে অরিজিৎকে না বললেও চলত।

কলেজ থেকে বেরিয়ে বাস ধরে শ্রীমানি বাজারের কাছে নেমে অনেকটা হেঁটে আমহার্স্ট্ স্ট্রীট। দু'চার বার গলি ভুল করে জগন্নাথ, করারই কথা। অবশেষে বাড়িটা খুঁজে পেল। নীচে থেকেই দেখল এতকালের অন্ধকারে পড়ে থাকা দোতলাটায় আলো জ্বলছে। অরিজিৎ আছে। জগন্নাথ সিঁড়ি বেয়ে ক্লান্ত পায়ে উঠতে লাগল।

সাড়া পেয়ে অরিজিৎ বেরিয়ে এল। এখন একটু হিমভাব বাতাসে, তবু ওর আদুর গা। সেই গায়ের চামড়া গজদন্তের মতো হলুদেটে সাদা। মুখ আর হাতের রঙ তামাটে। রোদে জলে ঐ হয়েছে। প্রথমে একটু থমকে গিয়েছিল জগন্নাথকে দেখে, তারপর একটু হাসল।

জগন্নাথের বড্ড লজ্জা করছিল। বস্তুতঃ সে খুঁজে খুঁজে অরিজিতের কাছে আজ কেন এসেছে তা ভেবে পাচ্ছিল না। একটু স্মিমিত গলায় বলল—তোর কাছে এলাম।

—আয়।

ঘরে ঢুকে জগন্নাথ দেখল, সেই পুরোনো আমলের আসবাবে বোঝাই ঘরগুলো প্রায় তেমনই আছে। ছ কোণা কাঠের টেবিল, তার সর্বাঙ্গে খোদাইয়ের কাজ, দুমানুষ সমান উঁচু বার্মা সেগুনের আলমারি, বেলজিয়াম আয়না লাগানো, আবলুশ কাঠের লেখার টেবিল, চেস্ট্ অব ড্রয়াস, হ্যাট্ স্ট্যাণ্ড—এসব আসবাব আজকাল আর দেখা যায় না। বিশাল মাঠের মতো বড় পালঙ্ক, হাতীর পায়ের

মতো মোটা পায়াওলা। মেঝেয় বরফি কাটা পুরোনো আমলের মোজেক, নতুন দুচারটে জিনিসের মধ্যে ঘরে টিউবলাইট এসেছে, একটা রেডিওগ্রাম, বুক কেস, বিছানায় একটা হাল আমলের বাটিকের কাজ করা বেডকভার। দেখেশুনে মনে হয় এবার বোধ হয় অরিজিৎ স্থিতু হবে।

রেডিওগ্রামে একটা রেকর্ড চাপানো ছিল। গান শেষ হয়ে খ্যাস্ খ্যাস্ শব্দ করছে, সেটা বন্ধ করল অরিজিৎ। প্রকাণ্ড একটা গদীওলা চেয়ারে বসে জগন্নাথ ক্লান্তিটাকে টের পেল। এ ঠিক শরীরের ক্লান্তি নয়। একটা মানুষ সব দিক থেকে ভেঙ্গে পড়লে যেমন হয় ঠিক তেমন ক্লান্তি। সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার মতো। জগন্নাথ চোখটা বুজে বলল—তোর ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দে, একটা ছোট্ট আলো জ্বাল।

অরিজিৎ টিউবলাইট নিভিয়ে টেবিল বাতিটা জ্বালল। কোনো প্রশ্ন করল না। তার আত্মীয়-হয়ে যাওয়া চাকর সিধুকে ডেকে চায়ের কথা বলে দিল। তারপর মুখোমুখী আর একটা চেয়ারে বসে রইল।

জগন্নাথ চোখটা সামান্য খুলে দেখে, অরিজিৎ তার দিকে চেয়ে আছে। কলকাতার মানুষেরা এখন আর কেউ কারো প্রতি তেমন কৌতূহল বোধ করে না, মানুষে মানুষে সম্পর্কের পচনশীলতা তাদের কৌতূহল ক্ষয় করে দিয়েছে। কিন্তু অরিজিতের চোখে এখনো সজীব উদ্ভিদের মতো, জীবনীশক্তির মতো এক আগ্রহ রয়ে গেছে। মানুষ সম্পর্কে এখনো ওর ক্লান্তি আসেনি। জগন্নাথ বুঝতে পারে, অরিজিতের কাছে সে বোধ হয় এই জন্যই এসেছে।

জগন্নাথ সিগারেট ধরাল। সারাদিনে সে আজকাল অজস্র সিগারেট খায়। যত খায় তত তার স্নায়ু উত্তেজিত হয়, শরীর ক্লান্ত হয়। তবু খায়। সিগারেট ছাড়া থাকতে পারে না। সিগারেটের কোনো স্বাদ গন্ধ এখন আর সে বোধ করে না। জগন্নাথ বলল—

অরিজিৎ, তুই আমার ওপর রাগ করিসনি তো ?

—রাগ! রাগ করব কেন ?

—সেদিন তোকে আমি যা তা বলেছি।

অরিজিৎ ব্যাপারটা উড়িয়ে দেয়—দূর পাগল! তুই কিছু খারাপ বলিসনি। আমার ভবঘুরেমীটা এখন একটা ছদ্মবেশ মাত্র। আমিও কি তা বুঝি না ?

জগন্নাথ দুঃখিতভাবে বলে—আমি কিছু ভেবে বলিনি রে! তোকে বরাবর হিংসে করতাম, সেই হিংসে আজও রয়ে গেছে। আমরা যখন ঘরদোর গোছাচ্ছি তখন তুই দুনিয়ার মেলায় সাচ্চা হাটুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিস—এটা ঠিক আমার সহ্য হয় নি। তাই কমপ্লেক্স্ থেকে তোকে সেদিন খামোখা কতগুলো কথা শুনিয়েছি।

অরিজিৎ খুব মৃদু একটু হাসল, বলল—তোর কথা তুই ভাল জানিস। কিন্তু আমার মনে হয়, বারমুখো থেকে আমার কিছু লাভ হয় নি। সারা ভারতবর্ষ কমসে কম দশবার ঘুরেছি, তিব্বত, চীন, বার্মা এমন কি একবার পাকিস্তান পেরিয়ে মিড্ল-ইস্ট পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম, ইউরোপের দরজা থেকে ঘুরে এসেছি। কয়েক লক্ষ মানুষ দেখেছি, কিন্তু তাতে হলটা কী ? সংসারের জ্ঞান আমার কিছুই বাড়েনি। এখনো আমি মানুষ হিসেবে অপরিণত, বোধবুদ্ধি নাবালকের, গুছিয়ে কথা বলতে পারি না. তাই ভাবছি, এবার আমি —সংসারের সবই তো দেখা দরকার, যেমন বাইরেটা, তেমনি ভিতরটা কী বলিস ?

সুগভীর ক্লান্তিতে জগন্নাথ মাথাটা পিছনে হেলিয়ে চেয়ে রইল। বিস্বাদ সিগারেট, ঠোঁটটা জ্বালা করছে। চেয়ে রইল অরিজিতের দিকে। তারপর করুণ একটু হেসে বলে—দেখতে ইচ্ছে হয় তো দেখিস, আমি তো দেখছিই, বড্ড মাথা ধরেছে, তোর সিধুকে একটু তাড়াতাড়ি চা দিতে বল্, আর যদি পারে তো পানের দোকান থেকে দুটো মাথা ধরার ট্যাবলেট—

—তোর কী হয়েছে? শরীর খারাপ?

—সব খারাপ, শরীর, মন, কপাল সব।

বাইরে ফিকে অন্ধকার, বাতাসে হিমভার অল্প একটু কুয়াশার আস্তরণ, জানালার বাইরে আলোজ্বলা কলকাতার আকাশ আবছা দেখাচ্ছে।

অরিজিৎ উঠে ভিতর বাড়িতে সিধুকে বলতে গেল। ফিরে এসে আবার বসল মুখোমুখী। তারপর মৃদু গলায় বলল—সেদিনের চেয়ে আজ তোকে রোগা লাগছে। এত অল্পদিনে মানুষের চেহারা পাল্টায় না, একটা কিছু হয়েছে জগন্নাথ!

—হয়েছে। তিক্ত গলায় জগন্নাথ উত্তর দেয়।

—কী?

—অরিজিৎ, আমি বড্ড ভয় পাই রে!

—কিসের ভয়?

—স্পষ্ট কোনো ভয় নয়। সেদিন কতকগুলো ছেলে চাঁদা চাইতে এসেছিল। ইতর টাইপের ছেলে, পাড়ার মস্তান টস্তান হবে। খামোখা চোখ গরম করে কথা বলছিল। তাদের সঙ্গে ছোট্ট একটা টাস্‌ল্ হয়ে গেল। বড্ড নার্ভাস লাগছিল সেই থেকে। কেবলই মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক হয়ে থাকার মধ্যে অনেক ট্রাব্‌ল্ আছে। চারদিকে কত অ্যান্টি ফোর্স, এত বিরুদ্ধ শক্তি যে এর মধ্যে ভদ্রলোক থাকা বড্ড মুস্কিল। ছেলেগুলো আমাকে অপমান করে গেল, কিছু করতে পারলাম না, মনে হচ্ছে কিছু করা খুব উচিত ছিল। সেই থেকে মনটা বড্ড চঞ্চল। তার ওপর বনলতা—

বলে কিছুক্ষণ উদাস চোখে চেয়ে থাকে জগন্নাথ।

অরিজিৎ অপেক্ষা করে।

জগন্নাথ শ্বাস ফেলে বলে—যাক গে, মোটকথা, মনটা ভাল নেই। ইচ্ছে করছিল কোথাও গিয়ে দুদণ্ড শান্তিতে বসে থাকি, তোর কাছে চলে এলাম।

অরিজিৎ সমবেদনার গলায় বলে—বোস্ না তোর যতক্ষণ খুশী। কে তোকে ওঠাচ্ছে? তোর বাসায় ফোন থাকলে একটা ফোন করে দে, তারপর এখানেই আজ রাতে থেকে যা। সারা রাত জেগে দু'জনে গল্প করব।

জগন্নাথ মাথা নাড়ল—না রে, তা হয় না। বনলতা একা থাকবে।

অরিজিৎ চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বলল—জগন্নাথ, সংসার করার ঐ একটা অসুবিধে।

কী?

—ঐ যে বললি বনলতা একা থাকবে! কে একা থাকবে সেই চিন্তায় আমি আর কোথাও থাকতে পারব না, সংসারের এইটেই সবচেয়ে বড় অসুবিধে।

—তুই সেদিক দিয়ে সুখী অরিজিৎ। তোর কারও ভাবনা নেই।

অরিজিৎ হাসল—সেটাও অসুবিধে, আমার জন্য কেউ ভাবছে না, অপেক্ষা করছে না। আমার কেউ নেই—এই চিন্তাও বড় অসহ্য। বুঝলি জগন্নাথ, সুখ আসলে কোথাও নেই, সুখের চিন্তায় একমাত্র সুখ আছে।

—আমার তাও নেই। আমার সুখের চিন্তাও শেষ হয়ে গেছে।

—কেন রে?

—আমার আর কিছু হয়ে ওঠার নেই। আমি যা হয়েছি সেই পর্যন্তই আমার লিমিট্। তার ওপর বিয়েটা করে ফেলেছি, মেয়েদের নিয়ে সুখের সংসারের ছবি দেখা ফিনিশ্। আর কী বাকী থাকল বল!

—সমস্ত পৃথিবীটাই তো বাকী থাকল রে। পুরো জীবনটা।

—সে সব তোর ব্যাপার। গোটা পৃথিবী বা পুরো জীবন নিয়ে আমার আর ভাবনার কিছু নেই। আমি ফাঁদে পড়া মানুষ, বয়স হয়ে গেছে, সব ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়েও পড়তে পারবনা। আমার জীবনে একটাই মাত্র জানালা খোলা আছে আর। বই। কেবল

বই আর বইয়ের মধ্যে ডুবে যাওয়া ছাড়া কিছু করার নেই।

—তোর কী হয়েছে জগন্নাথ?

জগন্নাথ সে কথার উত্তর দিল না। অন্যমনে বলল—কদিন আগে কলেজে একটা উটকো লোক এসে হাজির। বনলতাদের বাড়িতে এককালে আশ্রিত ছিল, এখন রাণাঘাটে পোলট্রি করেছে। আমার ধারণা, ছেলেটা বনলতাদের বাসায় চাকর বাকরের কাজ করত। অবশ্য এখন ভদ্রলোক হয়ে গেছে। সে এসে আমাকে বিস্তর উপদেশ দিল, একটু চোখও রাঙাল। বনলতাকে বিয়ে করেছি বলে বিস্তর লোক আমার ওপর চটা।

অরিজিৎ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে—কেন?

জগন্নাথ ম্লান হাসে—কী জানি, ঠিকঠাক সব বলতে পারব না। তবে শেষ পর্যন্ত আমার বিয়েটা বোধহয় টিকবে না রে অরিজিৎ।

—কী সব বলছিস! বিয়ে তো সন্থ করেছিস!

—জগন্নাথ নিথর বসে থাকল। চোখ বোজা। অসীম ক্লান্তি।

সিধু লুচি আলুর দম করে এনেছে। চা আর মাথাধরার বড়ি। খাবারটা জগন্নাথ ছুঁলও না। চা দিয়ে বড়ি দুটো গিলে ফেলল। চা টুকু খেল নিঃশেষে তারপর। আবার সিগারেট।

অরিজিৎ তার আগ্রহী এবং স্নেহাশীল চোখ দুটো মেলে চেয়ে আছে কেবল। জগন্নাথের সমস্যা সে কিছুই জানেনা। তবু তার আগ্রহ এবং উদ্বেগ দুই-ই তার চোখে ফুটে আছে। মানুষ সম্পর্কে এখও তার ক্লান্তি আসেনি।

জগন্নাথ কপালটা ডানহাতে টিপে ধরে বলল—আমার প্রবলেমের কথা বলে কোনো লাভ নেই। প্রতিটা লোক প্রতিদিন একে অন্যকে নিজের দুঃখের কথা শোনাতে থাকে। ব্যাপারটাকে আমি ঘেন্না

করি অরিজিৎ। আমি তোর কাছে কিছু বলতে আসিনি। শুধু তোর ঠাণ্ডা ঘরটায় নিঃঝুম একটু বসে থাকব কিছুক্ষণ।

অরিজিৎ জগন্নাথের মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল। বলল —বাতিটা নিভিয়ে দিই, তুই বসে থাক। যতক্ষণ খুশী।

—না না। তুই বোস। আমি তোকে দেখব। অরিজিৎ, তুই ঠিক সংসারের মানুষ নোস বলেই আমি তোর কাছে এসেছি। এখনো তুই বেশ ফ্রেশ আছিস। তোর শরীরে আর মনে এখনো প্রচুর ক্যালসিয়াম ভিটামিন ক্লোরোফিল। তাজা ডাঁটো একটা গাছের মতো আছিস এখনো। তোর কাছে এলে এখনো রোদ বাতাস আর গাছপালার গন্ধ পাওয়া যায়। তুই বসে থাক আমার সামনে। আমার মতো তোকে এখনো শহুরে রোগ ধরেনি।

অরিজিৎ প্রথমটায় অবাক হয়েছিল, পরে হেসে ফেলল—কী আবোল তাবোল বকছিস? ক্যালসিয়াম ক্লোরোফিল ওসব আবার কী?

জগন্নাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—তুই ঠিক বুঝবি না। ভাবি, আমি যদি গেঁয়ো চাষা হতাম তাহলে আমার এতসব ছেঁদো সমস্যা থাকতো না। থাকগে। তুই হয়তো কী না কী ভাবছিস! তার চেয়ে তোর কথা বল। এত ঘুরে টুরে এলি, এখন কী করবি?

অরিজিৎ মাথা নাড়ল—কী করব? কিছু করার নেই, চাকরির বয়স পার হয়ে গেছে, কিছুই তেমন শিখিনি চাকরি পাওয়ার মতো।

—কী করে তবে তোর সময় কাটবে?

—চলে যাবে। খাওয়া পরার তেমন ভাবনা নেই, বুঝলি! বাড়ির নীচের তলায় ভাড়াটে আছে, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা সুদে বেড়েছে, একা মানুষ, চলে যাবে।

—একা! একাই থাকবি?

—তারও কিছু ঠিক নেই। মাঝে মাঝে ভাবি, একাই ভাল। আবার কখনো কখনো একা থাকতে ভারী ভয়ও করে। বন্ধুবান্ধবরা

সব সংসারী হয়ে গেছে, আড্ডা মেরে সময় কাটানোরও উপায় নেই।

—বিয়ে করবি?

—ভাবছি।

জগন্নাথ চুপ করে রইল। এসব আল্‌গা কথা। কোনো মানে নেই।

অরিজিৎ মুখ নীচু করে নিজের নখ দেখতে দেখতে বলল—একজন প্রকাশক ধরেছে একটা ভ্রমণ কাহিনী লিখে দিতে।

বলে মুখ তুলে হাসল।

—কী লিখে দিতে?

—ভ্রমণ কাহিনী। এখন নাকি বাজারে প্রচুর ডিম্যাণ্ড। শহুরে লোকেরা ঘরে বসে মানস ভ্রমণ করতে ভালবাসে। কিন্তু আমার তো লেখা টেখা আসেনা, তাই গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছি কদিন ধরে, তবু এ একটা নতুন রকমের খেলা। রাজ্যের ভ্রমণ কাহিনী কিনে এনেছি, কয়েকটা ডিকশনারী আর কাগজপত্র। সারাদিন লিখি আর কাটি। মনের মতো হয় না।

জগন্নাথ অনেকক্ষণ বাদে হাসল, বলল—ছাখ, যদি লাগাতে পারিস।

অরিজিৎ উদাস হয়ে বলে—দূর, সব কি লেখা যায়? একটা সূর্য ডোবার যে রঙ তার সব সৌন্দর্য কি লেখায় আসে? লিখতে গিয়ে তাই বড্ড দুর্বল লাগে। দেখেছি, অনুভব করেছি, আনন্দিত হয়েছি। সেটা আর পাঁচজনকে বোঝাই কী করে? কেবল সুন্দর মনোহর, অতীব চমকপ্রদ—এ আর কত লেখা যায়?

জগন্নাথ হাসতেই থাকে।

অরিজিৎ হাসিটায় সংক্রামিত হয়ে হেসে বলে—মানুষের ভাষা বড় লিমিটেড। জগন্নাথ, তুই আমাকে একটু আধটু লিখতে শেখাবি?

জগন্নাথ নিজের এলো মেলো লম্বা চুল মুঠো করে ধরে থেকে

বলল—আমিও ভাষার কিছু জানিনা। জানিস, সেদিন ঐ ছেলে-গুলোকে খুব অপমান করার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কী বললে অপমান করা যাবে সেই ল্যাংগুয়েজটা খুঁজেই পেলাম না। আমার স্টক অব্ ওয়ার্ডস্ বড্ড কম, ভেবে দেখেছি।

একটু চুপ করে থেকে জগন্নাথ একটু গাঢ়স্বরে আপনমনে বলল—ভাষা যে কী জিনিস অরিজিৎ, কী সাংঘাতিক! যে ভাষায় একদিন বনলতার সঙ্গে প্রেম করেছিলাম সে ভাষাটা কোথায় গেল? সেদিন ছেলেগুলোর দিকে যখন রুখে যাচ্ছিলাম সেদিন বনলতা পথ আটকে দাঁড়াল, আমি ওর চুল ধরে টেনে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে ওকে গাল দিলাম—ইউ বিচ্! সেই থেকে আমাদের মধ্যে ফাটলটা বড্ড স্পষ্ট হয়ে গেল। ল্যাংগুয়েজের একটু গোলমালে কত কী হয়ে যায়?

অরিজিৎ একটু অবাক হয়ে বলে—বললি? ঐ কথা কেউ বৌকে বলে? এমন তো কিছু দোষ করেনি তোর বৌ।

জগন্নাথ জ্বালাধরা চোখে চেয়ে বলে—মানুষের যখন ভাষা পাল্টে যায় তখন আসলে ভিতরে ভিতরে মানুষটাও পাল্টায়। নইলে আমি ওকে ওকথা বলব কেন? আমি চিরকাল ভদ্রলোক। কিন্তু তবু কিছুতেই কথাটা আটকাতে পারলাম না। আণকণশাস্লি বেরিয়ে গেল। তখন খেয়াল করিনি কিন্তু, তারপর অনেকবার ভেবে দেখেছি কথাটা কি করে এল আমার জিভে! ভেবে পাইনি। নিজের ভাষাকে আমার বিশ্বাস নেই।

সতর্ক গলায় অরিজিৎ প্রশ্ন করল—তোদের প্রবলেমটা কী?

জগন্নাথ অসুস্থ একটা হাসি হেসে বলে—আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। ভালবাসার বিয়ে, তারপর সুখের দিন যাচ্ছিল। অবশ্য আমরা জাতটা মানিনি, বনলতা বামুনের মেয়ে। সেইজন্য আমার পরিবার থেকে একটা আপত্তি উঠেছিল। মা একদম মানতে চায়নি, তার কেবল পাপের ভয়! বামুনরা যতই মুর্গী খাক ওদের

এখনো বেশীর ভাগ লে-ম্যান ভয় খায়। প্রতিলোম বিয়ে বলে তাই মা ভয়ে অস্থির। আমাকে তাই আলাদা হতে হল। বনলতার বাবা অবশ্য জাত ফাত মানেন কিনা জানিনা, কিন্তু গোলমালটা ওদিকেও দেখা দিয়েছে। ওর বাবা বড্ডরাশভারী, বিশাল চেহারা, বিশাল চাকরি, বিশাল পার্সোনালিটি, বনলতা তার একমাত্র মা-মরা সন্তান। পাত্র হিসেবে আমাকে তিনি গণ্যই করেন না। তিনিও আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেননি। কৌশিক ব্যানার্জি নামে একটি ছেলের সঙ্গে বনলতার বিয়ে ঠিক হয়েছিল, বনলতার বাবা পাকা কথাও বলেছিলেন! সেই সময়ে আমরা লুকিয়ে রেজিস্ট্রি করি। সেইজন্য বখেরা।

অরিজিৎ একটা শ্বাস চেপে রাখল। তার মুখটা ম্লান দেখাল একটু সময় চুপ করে থেকে সে বলল—জগন্নাথ, কাজটা বোধ হয় তুই ভাল করিসনি।

জগন্নাথ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—করিনিই তো। তবু আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো প্রবলেম ছিল না। উই বোথ ওয়্যার হ্যাপী। কিন্তু সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য। এত লোককে অসন্তুষ্ট করে বোধ হয় সুখী হওয়া যায় না। তুই কি অভিশাপ টাপ মানিস?

অরিজিৎ বলে—দূর!

—আমি আজকাল মানছি।

—কেন?

—অভিশাপ ছাড়া কী বল? দুটো নিষ্পাপ সুখী স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আচমকা এ কী গেরো? বাইরে থেকে দেখলে কোনো প্রবলেম নেই, তবু কেউ কারো শরীর ছুঁতে পারছিনা, কথা বলার সময়ে সাবধান হয়ে যাচ্ছি। কী যে হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

অরিজিৎ সান্ত্বনার কথা বলবে, আশা করেছিল জগন্নাথ। কিন্তু অরিজিৎ তা বলল না। অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে বলল—আমি বিস্তর ঘুরেছি জগন্নাথ,তার ফলে আমার কিছু প্রত্যক্ষজ্ঞান বেড়েছে

আমি দেখেছি মানুষ বাই নেচার ক্লাসিফায়েড।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে সুস্পষ্ট শ্রেণীভেদ আছে। জাত মানিস বা না মানিস মানুষে মানুষে যে পার্থক্য আছে তা আমার অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য। বর্ণাশ্রম আমি মানি। মানুষের বৈশিষ্ট অনুযায়ী তাকে শ্রেণীভাগ করা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, অবশ্য তাকে ছেঁদো জাতিভেদে রূপান্তরিত করে নিলে অন্য কথা। কিন্তু এটা ঠিক, প্রকৃতিতে হুবহু একরকমের একজাতের কোনো গাছ, পশু, পাখী নেই। মানুষের তাই।

—তাতে কী হল ?

—এই পার্থক্য বর্ণাশ্রম।

—হোকগে। কিন্তু আমার প্রবলেমের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক ? গম্ভীর ক্লান্তি আর হতাশার সঙ্গে প্রশ্ন করে জগন্নাথ।

চুপ করে থাকল অরিজিৎ। তারপর আস্তে আস্তে ধীরে বলল—হয়তো নেই। আমি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কীরকম হয় তা তো জানিনা, তোদের প্রবলেমটাও খুলে বলিস নি। তবে হয় তো এটা তেমন গভীর বা জটিল কিছু নয়। মিটে যাবে। কিন্তু তাহলেও বলি, এরকমটা না করলেও পারতিস। বহুদিনের পুরোনো একটা প্রথা, তার পিছনের কারণ বা উদ্দেশ্য না জেনে সেই প্রথাকে ভেঙে ভাল করিসনি।

বিরক্ত হল জগন্নাথ। আবার সিগারেট ধরাল। অরজিতের শান্ত মুখচ্ছবির দিকে চেয়ে বলল—প্রথা ভেঙেছি বলেই কি অশান্তি?

—তা বলিনি।

জগন্নাথ একটু রাগের স্বরে বলে—অরিজিৎ, সংসারের সম্পর্ক-গুলো অত সরল করে বোঝা যায়না। আমাদের প্রবলেমটা জটিল।

—জানি।

—কী জানিস ?

অরিজিৎ লাজুক মুখভার করে বলে—জানি বলাটা ভুল হল। জানলাম। তুই জানালি।

—কিছু জানিসনা।

—তাহলে জানিনা।

জগন্নাথ সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে পিষে ফেলে আবার একটা ধরাল। তারপর হঠাৎ বলল—নীতা নামে একটা মেয়ে ছিল, বুঝলি। আমারই ছাত্রী। মাঝে মাঝে ক্লাশের বাইরে আমার কাছে পড়া বুঝে নিতে আসত। আমার কোনো দুর্বলতা ছিলনা, কিন্তু ওর ছিল। মেয়েটা বড্ড ভাল। খুব সুন্দর টুন্দর কিছু নয়, আটপৌরে। কিন্তু স্বভাবটি ছিল ঠাণ্ডা, মনে হয় খুব একটা বুকছেড়া ভালবাসা ছিল তার আমার প্রতি, পাত্তা দিইনি। আজকাল সেই নীতার কথা খুব মনে পরে। মেয়েটা হয়তো এই জীবনে খুব সুখী হতে পারবেনা।

জগন্নাথ একটা শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

—চললি?

—যাই। তোর ঘরটা আর তেমন ঠাণ্ডা নেই, আগে যেমন ছিল। ভেবেছিলাম তোর এই ঘরটায় বসে পুরোনো কথা বলব খানিকক্ষণ, মনটা হালকা হয়ে যাবে। হল না। বয়েসটা নেই, মনটাও নেই।

অরিজিৎ কথা বলল না।

জগন্নাথ বলল—তুই ভ্রমণকাহিনীটা লেখ। আমি গিয়ে আমার নিরানন্দ ঘরটিকে ফেস্ করি।

সিঁড়ি ভেঙে জগন্নাথ নেমে এল।

তার কেবলই মনে হয়, যেখানেই সে যাক কোথাও তার জন্য কোনো ঠাণ্ডা, নিঃঝুম একটা জায়গা নেই যেখানে সে দুদণ্ড বসে থাকবে।

কাল একবার ভিসাটার খোঁজ করতে যাবে সে।

॥ নয় ॥

রাতে ভাল ঘুম হয় না আজকাল।

এখন প্রথম শীত পড়েছে। তূলোর কম্বলে ওয়ার দিয়ে গায়ে দিলে পাতলা একটা ওম্ হয়। চড়াই পাখীর বুকের মতো। তাতে নিঃঝুম ঘুম হয়। কিন্তু বনলতার হয় না। মাথাটা বড্ড গরম হয়ে ওঠে। মাঝরাতে উঠে বাথরুমে যায়, হিম হয়ে থাকা জল কপালে, ঘাড়ে থাপড়ায়। আবার চুপ করে এসে শোয়। চোখ লেগে আসে। তখনই আবার দুঃস্বপ্ন দেখে। চমকে ঘুম ভেঙে যায়।

জগন্নাথও কি ঘুমোয়? বোধহয় না। মাঝেমধ্যে দেখেছে সে। জগন্নাথ উঠে সিগারেট খাচ্ছে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। বনলতা চেয়ে থাকে। বড্ড কষ্ট হয়। এই লোকটাকে সে কত ভালবাসত কদিন আগেও! আজও কি বাসেনা? কিন্তু ভালবাসা জিনিসটা সঠিক হিসেবে আসেনা। সকলের ভালবাসা কি সকলের মাপমতো হয়? বৃথা এক ভালবাসার রক্তস্রোত এক গোপন ক্ষতস্থান থেকে ড্রিপ্ ড্রিপ্ করে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে যাচ্ছে। তার সামনে অঞ্জলি পেতে বসে কে ভিক্ষা করছে? কে পান করছে পিপাসার্তের মতো? কেউ না। রক্তক্ষরণ বৃথা বয়ে যায়।

সর্বক্ষণ বনলতা তার বাবার কথা ভাবে আজকাল, আর ঘুমের মধ্যেও শুনতে পায় একটা দূর উড়োজাহাজের ম্লান কিন্তু অবিরল শব্দ। কলঘরে যখন কলের জল বয়ে যায় বেখেয়ালে, তেমনি এক উদাস করা শব্দ সেটা। উড়োজাহাজের কথা কেন বনলতার মনে আসে? সে তো কৌশিকের দিকে একবারের বেশী তাকিয়েও দেখেনি। একটা উড়োজাহাজ কোথায়, কত দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে একটা অচেনা লোককে সে। আর এই এক ঘুমহীন অন্ধকারে নিজের হৃদয়ের ভিতরে সেই শব্দটাই বাগান থেকে উড়ে আসা বোকা

ফড়িঙের মতো উড়ে উড়ে বসে, পাখা কাঁপায়।

এও কি ভালবাসা? বনলতা আর এসব বিশ্বাস করে না। বড় খাট, তার একপাশে বনলতা, পড়ে থাকে। কদিন হল জগন্নাথ তার আলাদা বিছানা করেছে চৌকিতে। এক ঘরের দু পাশে দুজন। শরীর স্পর্শ হয় না। কথাবার্তা কমে গেছে ঢের। চোখাচোখি তারা এড়িয়ে চলে।

কিছু হয়নি। বাইরের কোনো কলহ নয়, অপমানও নয়। ভুল বোঝাবুঝি নয়। শুধু একদিন মারকুটে বাজে কতকগুলো ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাচ্ছিল বলে জগন্নাথকে আটকাতে গিয়েছিল সে। জগন্নাথ বনলতার অমন সুন্দর চিকন কেশরাশি দু হাতে মুঠো করে চেপে ধরে বলেছিল—ইউ বিচ! কেন বলেছিল? ভাবতে গেলে বনলতার দুটো চোখের কোল জুড়ে টল্‌টলে জল জমে ওঠে, কেন বলেছিল জগন্নাথ? মুখ ফোসকে যে কথা বেরোয় তার কি কোনো শিকর থাকেনা? সে কি হঠাৎ উড়ে আসা কথা? সে কি বাইরে থেকে আসে?

তা নয়, বনলতা জানে, একসময়ে বাবা তাকে শিখিয়েছিল মুখ ফস্‌কা কথা বলে কিছু নেই। কথার জন্ম মুখে হয় না। কথা জন্মায় মানুষের গহীন, অন্ধকার মনে। সেই মন কে কারটা দেখতে পাচ্ছে? বনলতা জানে, জগন্নাথ কিছু সচেতনভাবে ভেবে বলেনি। ছেলেগুলোর ওপর বড্ড রেগে গিয়েছিল বলে তার মাথার ঠিক ছিল না, মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। ওটুকুর জন্য ক্ষমাও করা যেত জগন্নাথকে। কিন্তু ক্ষমা জগন্নাথ চাইছে না। একবার উন্মুখ জগন্নাথ বনলতার দিকে অকপটে তাকিয়ে যদি একবার ক্ষমা চাইত! বনলতা তাই জানে, কথাটা মুখ ফস্‌কে বেরোলেও মনে কখনো না কখনো তার জন্ম হয়েছিল, মানুষ এরকম আচমকা কখনো না কখনো তার অন্ধকার মনটাকে প্রকাশ করে ফেলে।

বনলতার ঘুম আসে না। সারা রাত কেবলই পাশ ফেরে।

পাশ বালিশ আঁকড়ে ধরে। বিছানাটা শরীরের তাপে গরম আর অসহ্য হয়ে যায়, আবার তখন পাশ ফিরে ঠাণ্ডা দিকে চলে যায় সে, বালিশ উল্টে শোয়। ঘুমোয় একটু, স্বপ্ন দেখে, জেগেই থাকে বেশী।

সকাল বেলাটায় একরকম ভালই থাকে বনলতা, রান্নাঘরে তার তখন হাজার কাজ। কাজ অবশ্য যেটুকু তা বনলতার অগোছালো স্বভাব আর অনভ্যাসের জন্য হাজার গুণ বাড়ে। ডালের জল পড়ে উনুন নিভে যায়, তরকারী কাটতে বসে আঁচ বইয়ে দেয়, আবার কয়লা ঢেলে আঁচ করতে গিয়ে গুচ্ছের কয়লা নষ্ট. এরকম কত কী হয়! তবু সে সময়টুকু ব্যস্ত থেকে কিছুক্ষণ অন্ততঃ সে তার উড়ো-জাহাজের শব্দ আর গোপন রক্তক্ষরণের হাত থেকে রেহাই পায়। ততক্ষণ চোখের জলটুকুকে অন্ততঃ আটকাতে পারে।

জগন্নাথ আজকাল সকালে খবরের কাগজ মুখে করেই কাটায়। চা চায় না। বনলতাই নীরবে বার তিনেক চা দিয়ে যায়।

শিশিরে ভেজা কবোষ্ণ এই প্রথম শীতের সকালগুলো তাদের কত সুন্দর কাটতে পারত! বয়ে যায়, ঝরে যায়, নষ্ট হয়ে যায় তাদের সুন্দর সময়। অভিমানে? না, তাও নয়। অভিমানের ভিতরেও একটা কিছু আছে যা ক্রমশঃই ভালবাসাকে নষ্ট করে দেয়। কিন্তু এ ঠিক অভিমানও নয়। এ হচ্ছে ব্যবধান।

সকালে আজ সেই ব্যবধানটাই টের পেল বনলতা।

ঠিকে ঝিটা বড্ড সেয়ানা। বনলতাদের রেশন কার্ড নেই, খোলা বাজার থেকে চাল-চিনি কেনে তারা। ঠিকে ঝি কদিন হয় একটু সস্তায় তার নিজের রেশনের চিনি দেয় বনলতাকে। তাতে তার প্রতি কেজিতে দুটাকা লাভ থাকে। তবু পাঁচশো গ্রামের

হরলিক্সের শিশি ভরে না কেন এই নিয়ে আজকাল একটু খুঁত খুঁত করতে শিখেছে বনলতা। আগে খেয়াল করত না, ঝিও সুযোগটা নিত। বনলতা সেয়ানা হচ্ছে দেখে ঝি আজকাল নতুন কায়দা করে। যতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণ বনলতাকে এ বাড়ি সে বাড়ির গল্প শোনায়। খুব আন্তরিকভাবে বনলতার শরীরের খবর নেয়, সংসারের গল্প টল্প শুনতে চায়। কথা বলার লোক পেয়ে বনলতা প্রশ্রয়ও দেয় তাকে। চিনির মাপ নিয়ে কথাটা আর ওঠে না।

ঝি আজ সকালে চমৎকার একটা গল্প ফেঁদেছিল। একটা নতুন বৌ আর তার খিট খিটে শাশুড়ির ঝগড়ার কথা। শেষে একদিন বৌটার শান্তশিষ্ট বর কেমন করে আস্তে আস্তে মায়ের ওপর বিরক্ত হতে হতে গায়ে হাত তুলে ফেলল সেই গল্প। গল্পটার চূড়ান্ত জায়গায় এসে বনলতা শুনতে পেল সদরের কড়া নড়ছে। গা করল না। প্রায় সময়েই আজকাল জগন্নাথের ছাত্ররা নম্বর জানতে আসে। এসে এসে ফিরে যায়। পরীক্ষার খাতা ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। জগন্নাথ ছোঁয়নি এখনো।

কিন্তু আজ কড়া নাড়ার শব্দ হতে না হতেই জগন্নাথ চীৎকার করে ডাকল—বনলতা, দেখে যাও—

সেই ডাকে বনলতা কেঁপে উঠল না, চমকাল না, আনন্দিত হল না। গত প্রায় পনেরো দিনে যে জগন্নাথ একবারও তাকে এরকম ভাবে ডাকেনি সে কথাও মনে পড়ল না। নিরুত্তাপভাবে সে উঠল। বাইরের ঘরে এসে দেখল, খুব সাজ পোষাক পরা দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে একটি প্যাণ্ট পরা ছোকরা, ছোকরাটার চেহারায় জগন্নাথের ছাপ আছে।

দুজনের মধ্যে একজন মেয়ে সুন্দরী আর অহংকারী। সে নিষ্পলক এবং তীক্ষ্ণ চোখে বনলতাকে দেখছিল। অন্য মেয়েটির বয়স সুন্দরজনের চেয়ে একটু বেশী, বাড়ন্ত মোটাসোটা আহ্লাদী

চেহারা, কপালে সাদা টিপ, পরনে সাদা খোলের শাড়ি, মুখে হাসি, হাতে মিষ্টি-টিষ্টির বাক্স, একটা শাড়ির প্যাকেটও।

সেই এগিয়ে এসে হঠাৎ প্রণাম করে বলল—বৌদি, আমাদের তো চেনোও না! আমরা তোমার দুই ননদিনী আর এটি তোমার দেওর। দেওরটি পেটুক। ননদিনীরা ঝগড়ুটে, খুব সাবধান।

বলে হাসল খুব। সুন্দররঞ্জন এক বারও হাসল না।

—এসো। বনলতা নিরুত্তাপ গলায় বলল।

জগন্নাথের পরিবারের কাউকেই সে চেনে না। এই প্রথম সে ওর পরিবারের লোকজন দেখছে।

সঙ্গের ছেলেটি অর্থাৎ তার দেওর ভারী লাজুক। মুখখানি মিষ্টি, চোখ তুলে তাকায় না। সে প্রণাম করার পর সুন্দররঞ্জন যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে এল।

বনলতা বলল—থাক না ওসব।

—না, থাকবে কেন? সম্পর্কে তো তুমি বড়োই! সুন্দররঞ্জন বলল।

মোটা মেয়েটি বলল—আজ কিন্তু থাকছি আমরা, বুঝলে? সারাদিন! খাবো দাবো আর তোমার ঘরসংসার দেখব।

বনলতা আস্তে আস্তে করে বলল—আচ্ছা দেখো। এতদিনের মধ্যে বুঝি আসার সময় হয়নি?

—কী করে হবে? আমরা দু বোন এবার একসঙ্গে প্রি-ইউনিভার্সিটি দিলাম যে!

—ও!

—শাড়িটা দেখ তো বৌদি, পছন্দ না হলে দোকানদারকে বলা আছে বদলে দেবে।

—দেখব'খন! রান্নাঘরে যে আমার কড়াই পুড়ে গেল।

—যাক্‌গে। আগে দেখ। আর রান্না বান্নার চার্জ, আজ আমরা নিচ্ছি। তুমি একটু সাজো তো নতুন বৌকে একটু দেখি

কনের সাজে। তুমি আজ বিবি সেজে বসে থাকবে কিন্তু বৌদি, মাইরি বলছি।

জগন্নাথ আবার খবরের কাগজে মুখ ঢেকেছে, আড়চোখে দেখে নিল বনলতা। একটা দীর্ঘশ্বাস ভেঙে কয়েকটা দ্রুত শ্বাস ফেলে নিল সে। এরা সব জগন্নাথের বোন, ভাই, কিন্তু তার কে ?

সুন্দর মেয়েটা কথা বলছে না, কিন্তু প্রায় এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অহংকারী মুখচোখ, এবং চোখে একটা ঈর্ষার জ্বালাও আছে বুঝি। সুন্দরীদের এই এক মুস্কিল, অন্য সুন্দরীর মুখোমুখী হলেই তারা বড্ড সচেতন হয়ে ওঠে। বনলতা নিজের চেহারা নিয়ে কতকাল ভাবে না।

—তুমি রেবা, না ? বনলতা সুন্দরীজনের দিকে তাকিয়ে বলে।

—হুঁ। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে রেবা মুখটা ফিরিয়ে নেয়।

—কী সুন্দর তুমি!

—ছাই। তোমার কাছে কিচ্ছু না। সে বলল।

বনলতা একটু হাসল। ঠিকই, সে এখনো যা সুন্দর তার কাছে বহু সুন্দরই ম্লান হয়ে যায়। তবু সে বলল—আমার আর চেহারা কী! বিয়ের আগে যাও বা একটু ছিল, এখন সব গেছে।

মোটাজন খুব হাসতে থাকে, বলে—বৌদি ভাই, বিয়েটা কি তাহলে তোমার মনের মতো হয়নি ?

বলেই দাদার দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি জিব কাটল। জগন্নাথ অবশ্য এসব লক্ষ্যও করছে না। খবরের কাগজে মুখ ঢেকে আছে। আড়াল থেকে সিগারেটের নীল ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।

—চলো, তোমার রান্নাঘর দেখে আসি। বলে মোটাজন বনলতার কোমর ধরল অনায়াসে। চট্ করে আপন করতে পারে।

বামুনের মেয়ে বিয়ে করেছে বলে জগন্নাথের বাড়ি থেকে ব্যাপারটাকে কেউ অনুমোদন করেনি। প্রায় একঘরে অবস্থায় একা বিয়ে করেছিল জগন্নাথ। বিয়ে মানে রেজিষ্ট্রেশন, গড়গড় করে কত

গুলো সরকারী মন্ত্র বলা, তার পরই তারা বর-বৌ হয়ে যায়। বুঝি তাই আজও বনলতা নিজেকে বৌ-বৌ ভাবতে পারে না ঠিকমতো। সিঁদুর পরে নামের শেষে 'বোস' লেখে, তবু যেন সে, সেই বনলতা লাহিড়িই রয়ে গেল আজও।

রান্নাঘরে এসে মোটাজন বলল—তুমি বুঝি আমার নাম জানো না? আমি দয়াময়ী, সবাই দয়া কিংবা দয়ী বলে ডাকে।

বনলতা হাসল—জানি।

—তরকারী টরকারী বের করো, কুটে দিই। ভাইকে পাঠাই ডিম আনতে, ডিমের ডালনা হোক। হোটেল টোটেল কাছাকাছি নেই?

—হোটেল দিয়ে কী হবে?

—দয়া মুখ টিপে হাসল—মুর্গীর মাংস আনবো।

—মাছ আছে, ডিম আনানো হবে, আবার মুর্গীও?

—আজ ফিষ্টি করতেই এলাম তো। বাবা টাকা দিয়ে দিয়েছে।

রেবা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। মুখের ভাব এখনো কাঠ-কাঠ। গোমরা মুখেই বলল—তোর কেবল খাওয়া দিদি! সেই জন্যই মুটিয়ে যাচ্ছিস।

দয়ার মুখের হাসি শুকোয় না, গলায় হাসির গুরগুর শব্দ তুলে বলে—মোটা মানুষদের ধাত ঠাণ্ডা। আমার তোর মতো মেজাজ খারাপ হয় না রেবা, নতুন বৌদিকে দেখতে এসেছিস, একটু হাসবি তো!

—হাসার কী?

—তোর হাসি আসেই না। মোটারা হাসতে পারে। বলে বনলতার দিকে ফিরে বলল—এই বৌদি কাপড় টাপড় দাও! পোষাকী শাড়ি পরে তোমার রান্নাঘরের কালিঝুলি মাখবো নাকি?

বনলতা দুবোনকে আটপৌরে শাড়ি বের করে দিল। সোমনাথ—

জগন্নাথের ভাই গেল দোকানে ডিম, মাংস, দৈ কিনতে। কাপড় বদলে ছু বোন রান্নাঘরের দখল নিল।

বনলতার ক্লান্তি লাগছিল। জলচৌকির ওপর বসে সে দরজার পাটে মাথাটা হেলিয়ে রেখে বলল—তোমরা এ বাসায় প্রথম এলে আজ না হয় আমিই রাঁধি।

দয়া মাথা নাড়ল—সে হবেনা। আমরা জানি তুমি বড়লোকের আছুরে মেয়ে, সংসারে খাটা খাটনির অভ্যাস নেই। নতুন সংসারে এসে তোমাকে খুব খাটতে হচ্ছে। মা তাই পৈ পৈ করে বলে দিয়েছে আজ যেন নতুন বৌ রান্না না করে। বড়জোর পান টান সেজো, জল গড়িয়ে দিও, কিংবা স্টোভে একটু চা করতে পারো।

জগন্নাথ নিজের পরিবারের গল্প কখনো বনলতার কাছে করেনা, তবে বনলতা জানে, খুব গরীবঘরে জগন্নাথ মানুষ হয়েছে। পার্টিশনের পর তারা যখন এদেশে আসে তখন প্রায় ভিখিরিদশা। সেই থেকে আস্তে আস্তে তারা দাঁড়িয়েছে। জগন্নাথের বাবা একটা দোকান করে। জগন্নাথ তখনো তার মাইনের মোটা অংশ মাস পয়লায় গিয়ে বাবার হাতে দিয়ে আসে। এখনো কষ্টেই চলে জগন্নাথের সংসার।

দয়া সেই কথাই বলছিল—বৌদি, খরচ করাই দেখে ভেবোনা যে আমরা বড়লোক। অনেক হিসেব টিসেব করে আমাদের চালাতে হয়।

বনলতা ক্লান্ত গলায় বলে—জানি দয়া।

রেবা আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে হঠাৎ আবেগহীন গলায় বলল—দাদা আলাদা হওয়াতেই যত গণ্ডগোল। নইলে আমরা ভালই ছিলাম।

বেফাঁস কথা। দয়া তাড়াতাড়ি বলল—বাঃ, আলাদা হবে না তো কী? আমাদের একটুখানি বাসা।

রেবা তবু জেদী গলায় বলে—দাদার তো বিয়ে করার প্ল্যান ছিল

না এখন। সোমনাথ দাঁড়ালে তবে বিয়ে করার কথা। অন্তত একটা বোনের বিয়েও দেওয়া উচিত ছিল।

দয়া বলে—বাঃ, তা করতে গেলে বয়স বয়ে যাবে না? পাকা চুলে টোপর পরবে নাকি?

রেবা সোজা বনলতার দিকে তাকিয়ে বলল—কত কষ্ট করে আমাদের বিয়ের জন্য দাদা টাকা জমাচ্ছিল। হুট করে নিজেই বিয়ে করে বসল! দাদা কীরকম যেন হয়ে গেছে!

বনলতা জোর করে একটু হাসল। সংসার সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা কম, তবে সংসারে এসবই হয়। আঘাত প্রত্যাঘাত। সে জবাব দিল —মানুষ তো বদলায়।

—তাই দেখছি।

—আমি গুণ করেছি রেবা। বনলতা আবার বলল।

রেবা উত্তর দিল না। কিন্তু দয়া খুব হাসল। বলল—গুণ করবে না তো কী? আমি আমার বরকে কেমন গুণ করি দেখো।

সে কথায় কেউ হাসলনা।

রেবা বলল—আলাদা সংসারের খরচ কি কম? এই ফ্ল্যাটটারই তো কত ভাড়া। তার ওপর নতুন সব ফার্ণিচার, বিছানা-বালিশ কাপড়-চোপড়—

দয়া বলে—তুই এত হিসেবী জানতাম না তো রেবী! তবে কেন তুই সিনেমা দেখিস, পুজোর সময়ে কেন গতবারে পিওর শিল্ক নিলি জোর করে?

—তুই চুপ কর দিদি!

—ওর কথা তুমি ধোরোনা বৌদি। ভীষণ ঝগড়াটে! বলে দয়া।

বনলতাকে কোনো আঘাতই তেমন আঘাত করে না। সে ক্লান্ত মাথাটা তেমনি দরজায় হেলিয়ে রেখে বলে—বিয়ের আগে তোমার দাদার এসব হিসেব করা উচিত ছিল।

—ছিলই তো। সেই জন্যই তো বললাম, দাদা কীরকম যেন হয়ে গেছে।

—তুই চুপ কর রেবী। অত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলিসনা। দাদা শুনলে কী ভাববে?

—দাদার শোনাই উচিত।

বনলতা উঠে বলল—দয়া আমি দশ মিনিট একটু শুয়ে থেকে আসছি। বড্ড মাথা ধরেছে।

দয়া ব্যাগ্র হয়ে বলে—আমি সঙ্গে আসবো, টিপে দেবো একটু মাথাটা?

—না। একটু শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে। কিছু দরকার হলে ডেকো।

—কিছু দরকার হবেনা। আমরা সব খুঁজে পেতে নেবো। তুমি বরং মাথা ধরা সারলে নতুন শাড়িটা পোরো।

রেবা হঠাৎ মুখ তুলে বলে—বৌদি, শোওয়ার ঘরে আর একটা বিছানা কার? কেউ এসেছে তোমাদের বাড়িতে?

—না, বনলতা উত্তর দিল—আমরা আলাদা আলাদা শুই।

—আলাদা শোও? ভারী অবাক হয় রেবা।

দয়া বলে—আলাদা শোওয়াই আজকাল ফ্যাশান।

শোওয়ার ঘরে এসে বনলতা দেখল, জগন্নাথ তেমনি বসে আছে আধশোয়া হয়ে। খবরের কাগজ সামনে খোলা, কিন্তু সেদিকে মন নেই। অন্যমনস্ক ভাবে জানলার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে মাথায় লম্বা অবিন্যস্ত চুলে আঙুল ডুবিয়ে বিলি কাটছে। বনলতার হাতের বাউটি ছুটো বজ্র শব্দ করে, সেই শব্দে জগন্নাথ ফিরে তাকাল, চোখে চোখ।

—ওরা কি আজ থাকবে নাকি? জগন্নাথ জিজ্ঞেস করে।

—হুঁ।

জগন্নাথ হঠাৎ ঝাঁঝালো গলায় বলে—যত ঝামেলা! হঠাৎ

এভাবে ওদের আসার কী দরকার ছিল?

—তুমিই ওদের জিজ্ঞেস করো।

—কেন এসেছে তা তোমাকে বলোনি?

—বলেছে, ফিস্টি করতে এসেছে?

—কেন, এটা কি বোটানিক্যাল গার্ডেন নাকি যে ফিস্টি করতে এসেছে?

বনলতা একটু অবাক হয়ে যায়। জগন্নাথের সঙ্গে তার পরিবারের সম্পর্ক যে এতটা তেতো তা সে আন্দাজ করেনি। সেই তিক্ততার কারণ সে নিজেই কিনা তাই বা কে জানে। বনলতা কোনো উত্তর দিলনা। খাটের বিছানায় বেডকভার পাতা। নিভাঁজ সুন্দর বিছানাটায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

জগন্নাথের দেশলাই জ্বালাবার শব্দ হয়। সিগারেটের সুন্দর গন্ধটি পায় বনলতা। উপুর হয়ে শোয়া সে, দুহাতের মধ্যে ঢাকা তার মুখখানা। বনলতার চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে আপনা থেকেই।

জগন্নাথ অনেকক্ষণ বাদে বলল—ঐ যে ছোটোজন, রেবা, ও সবই লক্ষ্য করে যাচ্ছে। গিয়ে মাকে লাগাবে। বিচ্ছু একটি।

বনলতা চুপ করে রইল। শোয়ার ঘরে দুটো আলাদা বিছানায় তারা দুজন আধাশোয়া হয়ে বা শুয়ে আছে। তবু মনে দুস্তর এক সামুদ্রিক জলরাশির দূরত্বে তারা দুই চলিষ্ণু জলযান, যাদের পথ বিপরীতমুখী। এখন এই বিছানা থেকে ইচ্ছে করলে রুমাল নেড়ে জগন্নাথকে বিদায় জানানো যেতে পারে।

একটি হাত নরম ভাবে বনলতার মাথা স্পর্শ করে। একটু ঝিম্ ধরে থাকে বনলতা। না, জগন্নাথ নয়। এতটা সাহস জগন্নাথের আর নেই।

—বৌদি!

কার গলা তা ঠিক বুঝতে পারেনা বনলতা। তবে স্বরের নম্রতা আর আন্তরিকতা শুনে অনুমান করে, দয়া।

উম্‌— ! উত্তর দেয় সে।

—কড়া করে চা করে এনেছি। খাও।

—খাবোনা। চা আমি বেশী খাইনা। বনলতা মাথা না তুলেই বলে।

—ওঠোনা বৌদি ভাই ! তুমি রাগ করেছো।

কারো সামনে চোখের জল মোছা বড্ড মুস্কিল। তাই সহসা বনলতা মুখ তুলতে পারছিল না।

—বৌদিভাই, ওঠো।

স্খলিত আঁচল চোখের কোলে চেপে জলটা মুছে বনলতা উঠে বসে। তারপর অবাক হয়। চা করে এনেছে, দয়া নয়, রেবা। মুখের রুক্ষ ভাবটা যেন বৃষ্টিতে ধুয়ে কমনীয় হয়ে গেছে মেয়েটার। অকপট চোখে বনলতার দিকে একটু চেয়ে থেকে হঠাৎ গলা নামিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে—কাঁদছিলে ?

—না। ব্যথায় চোখে জল এসেছিল।

বনলতার হাতে চায়ের কাপটা দেয় রেবা। পাশে বসে। তারপর বনলতার বাঁ হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে তেমনি চাপা গলায় বলে—আমার মাথার অনেকগুলো স্ক্রু ঢিলে আছে। সবাই আমাকে পাগল বলে। আমার কথায় কেউ কিছু মনে করেনা।

বলে হাসল। ওর সামনের দুই দাঁতের মাঝখানে একটু পোকায় খাওয়া কালো দাগ। তবু হাসিটি যে কত সুন্দর তা এই প্রথম বোঝা গেল। সে আবার ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল—আমাদের বাড়িতে একমাত্র বাবা ছাড়া কেউ আমাকে দেখতে পারে না।

—কেন ?

—ঐ যে, বড্ড কথা শোনাই সবাইকে ! তেমনি ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে রেবা। বনলতার হাতখানা দুহাতে চেটোয় ময়দা মাখার মতো পিষতে পিষতে সে তেমনি চাপা গলায় বলল—আমার কথা ধরতে নেই বৌদিভাই। তুমি কেঁদেছো বলে আমারও কান্না পাচ্ছে। চলো

তো বাইরের ঘরে যাই, এখানে কথা হয় না।

বনলতা চুপ করে থাকে। চায়ে চুমুক দিয়ে তেতো মিষ্টি স্বাদটা অনুভব করে। জগন্নাথ তেমনি পাথরের মতো বসে আছে। বাইরে চোখ। বনলতা আর জগন্নাথের সম্পর্কের ব্যবধান যে কোনো বাইরের লোক তাদের বসবার ভঙ্গী থেকেই ধরে ফেলতে পারে। বনলতা ওঠে বলে—চলো।

তারা বাইরের ঘরে এসে বসে। বড় বেতের সোফায়, পাশাপাশি।

আর হাতটা ধরে থেকেই রেবা বলে—সামনের মাস থেকে তুমি কি আমাদের বাড়িতে থাকবে?

বনলতা প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে বলে—তার মানে?

—মানে আবার কী! সামনের মাস থেকে তো তোমাকে কোথাও গিয়ে থাকতেই হবে! হয় আমাদের বাড়ি, নয়তো তোমার বাপের বাড়ি।

—কেন?

—বাঃ, তবে কি এ বাসায় তুমি একা থাকবে? দাদা যে চলে যাচ্ছে!

বনলতার হঠাৎ একটু শীত করে বুঝি।

প্রশ্ন করে—কোথায়?

—তুমি আচ্ছা হাবা মেয়ে তো! দাদা ভিসা পেয়ে গেছে, এখন চলে যাবে না বিলেতে।

—ভিসা পেয়ে গেছে? বলে বনলতা একটু চেয়ে থাকে।

রেবা একটু সন্দেহের চোখে বনলতার দিকে চেয়ে থেকে বলে—কেন বৌদি, তুমি কিছু জানো না?

বনলতা সামলানোর চেষ্টা করে। বলে—জানি।

—তবে ওরম করছো কেন? যেন কিছু জানো না।

বনলতা চুপ করে থাকে।

রেবা তেমনি তার হাতখানা নিয়ে খেলা করতে করতে বলে—তুমি যদি বাপের বাড়ি থাকতে চাও তো আলাদা কথা। কিন্তু আমাদের খুব ইচ্ছে, তুমি আমাদের কাছে থাকো। একটু অসুবিধে হবে তোমার, কিন্তু দেখো আমরা তোমাকে নিয়ে খুব হুল্লোড় করব। সময়টা কেটে যাবে হু-হু করে। আমাকে যতটা খারাপ ভাবছো ততটা নই গো। তোমাকে খুব ভালবাসবো। থাকবে আমাদের কাছে?

বনলতা আস্তে ধীরে চা খেতে খেতে পা দোলায়। হঠাৎ তার ভার বুকখানা হালকা লাগতে থাকে। বদ্ধ ঘরে হঠাৎ যেন হাওয়া বাতাস খেলা করে যায়। বনলতা টের পায়, অদূরে তার মুক্তি।

সে হেসে বলে—দেখি। এখনো কিছু ভাবিনি।

—তুমিও একটা পাগল। আমার মতো। তারপর গলাটা আরো নামিয়ে রেবা কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে—কবে থেকে চলছে?

—কী?

—তোমাদের ঝগড়া।

—যাঃ, ঝগড়া কোথায়?

—তোমরা বড্ড ছেলেমানুষ বৌদি, সকলেরই ঝগড়া হয় কিন্তু বাইরের লোক এলে তাড়া ঝগড়াটা ঢাকা দিয়ে রাখে। তোমাদের ঝগড়া একটা বাচ্চাও বুঝতে পারে। বলোনা কবে থেকে!

পা দোলাতে দোলাতেই বনলতা বলে—ঝগড়া নয় রেবা।

—গুল দিওনা। নইলে ভিসার কথা তুমি জানোনা কেন?

—জানতাম। খেয়াল ছিলনা।

রেবা হাসে—খেয়াল ছিলনা? বর তিনচার বছরের মেয়াদে পাঁচ হাজার মাইল দূরে চলে যাচ্ছে, আর তোমার খেয়াল ছিলনা! তাহলে বলো, তুমি আমার দাদাকে ভালবাসোনা!

—কে জানে ভালবাসা টাসা আমি বুঝিনা।

—বোঝোনা তো বিয়ে করেছিলে কেন? ইয়ার্কী!

বনলতা হঠাৎ গলায় একটা গুড়গুড় শব্দ তুলে বাচ্চার মতো দুষ্টু হাসি হাসে। বলে —একটা অ্যাডভেঞ্চার করে দেখলাম।

রেবা হাসছিল। ক্ষীণ হাসিটা হঠাৎ গিলে ফেলে খুব সীরিয়াস গলায় বলল—বৌদি, একটা কথা বলব? কিছু মনে কোরোনা।

—বলোনা! জগন্নাথ ভিসা পেয়েছে, সামনের মাসে চলে যাবে, এই সংবাদটাই যেন হঠাৎ বনলতার সব ক্লান্তি হরণ করে নেয়। মনটা ভারী ঝরঝরে লাগে। পা দোলাতে দোলাতে সে উৎসুক চোখে রেবার দিকে চেয়ে থাকে।

রেবা নিবিড়ভাবে বনলতার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। চোখ না সরিয়েই বলল—তুমি এত সুন্দর যে তোমাকে যেমন তেমন ঘরে একদম মানায় না।

—ওটা বাজে কথা। আমি তেমন সুন্দরই নেই।

রেবা হাতখানা জোরে চেপে ধরে বলে—বাজে কথা বোলো না। তুমিও জানো তুমি কেমন সুন্দর। আমার দাদার কিছু গ্ল্যামার নেই। না চেহারায়, না চাকরিতে। উদ্বাস্তু কলোনীতে আমাদের বাড়ি। কী দেখে তুমি দাদার প্রেমে পড়লে বলো তো? আমি শুনেছি, তোমার বাবা খুব বড়লোক! তোমার জন্য খুব ভাল পাত্রও পাওয়া গিয়েছিল। তুমি ফ্রাংকলি বলো তো, কেন দাদাকে বিয়ে করলে!

বনলতা তেমনি হাসতে থাকল।

রেবা ভ্রূ কুঁচকে বনলতার দিকে চেয়ে থেকে বলে —আমরা সবাই এই নিয়ে বাড়িতে আলোচনা করি। মা আর বাবা অবশ্য ভাবে, তাদের ছেলে মস্ত কেউকেটা, তাকে বিয়ে করে তুমি বর্তে গেছ। তাদের আপত্তি অবশ্য তুমি বামুনের মেয়ে বলে। সেই কারণেই তোমাকে মা ঘরে নিতে খুঁত খুঁত করে। বলে—বামুনের মেয়ের প্রণাম টনাম নেওয়া যাবেনা, এঁটো ছোঁয়া খাওয়ানো যাবেনা, এমন বৌ বাড়িতে এলে বড্ড অস্বস্তি।

কোনো কথাই বনলতাকে স্পর্শ করেনা। সে হাসে।

রেবা একটা শ্বাস ফেলে বলে—আমরা কিন্তু মা বাবার মতো ভাবি না। আমরা আলোচনা করি। কী দেখে তুমি দাদাকে বিয়ে করলে। কিছুতেই আমাদের মাথায় আসে না! বলবে?

—বলবার মতো কিছু নয়। নিজেকে আমি তেমন কিছু ভাবিনা

রেবা বলে—তোমার মাইরি খুব বড়লোকের ঘরে বিয়ে হলেই মানায়। কেবল সাজগোজ, আয়নায় মুখ দেখা, নানা কস্‌মেটিক্‌স্‌, গাড়িতে করে মার্কেটিং—এই সবই তোমাকে মানায়। রান্নাঘরে বসে উনুন ধরানো, গেঞ্জী কাচা, ঝিয়ের সঙ্গে ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌ এসব তোমার কম্ম নয়।

বনলতা একটা চোরা শ্বাস টানল। বুকটা ফুলে উঠল অনেকটা।

রেবা মুখখানা গম্ভীর করে বলে—দাদা বড় হঠাৎ বিয়েটা করে ফেলল। ও যে কাউকে ভালবাসে তা কখনো টেরই পাইনি। মেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করত না। একটা মেয়ে—বলেই সতর্ক হয়ে থেমে গেল রেবা।

বনলতা মাথা নেড়ে বলে—জানি। নীতা তো?

রেবা ঝুঁকে বলে—তুমি জানো?

—জানি। চিনিও। একদিন এসেছিল এখানে। বড় ভাল মেয়ে।

রেবা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—খুব ভাল। আমাদের সকলের পছন্দ ছিল ওকে, কেবল দাদারই ছিলনা। দাদা বলত, ও হ্যাংলা মেয়ে। দাদার পিছনে লোভীর মতো ঘুরত, দাদার তাই রাগ।

বনলতা হাসে খুব, বলে তবে যে বলো তোমার দাদার কোনো গ্ল্যামার নেই। না থাকলে নীতা পিছু নিয়েছিল কেন?

—নীতা তো তোমার মতো নয়। সে সাধারণ ঘরের মেয়ে, তেমন সুন্দর টুন্দরও কিছু নয়। তার কাছে দাদা দেবতা। কিন্তু

তুমি বৌদি, তোমার কথা আলাদা।

—ওসব কথা থাক রেবা, যা হওয়ার হয়ে গেছে।

রেবা বনলতার হাতখানা তখনো ধবে রেখেছে। বলল—আমি বড্ড বেশী কথা বলি। সেই জন্য বকাও খাই। কিন্তু যা মনে আসে তা বলে না ফেলেও পারি না। এসব কথা বলা কি অন্যায় হল বৌদি ?

—কী জানি ভাই! তবে প্রসঙ্গটা ভাল লাগে না।

—তবে বলো তোমাদের ঝগড়া হল কী নিয়ে ?

—ঝগড়া হয়নি, বিশ্বাস করো।

—তবে তোমরা দুজন কেন গাল ফুলিয়ে আছো ? কেন আলাদা বিছানায় শোও ?

বনলতা একটু ইতঃস্তত করে বলল—সেটা হয়তো ভুল বোঝাবুঝি।

রেবা গম্ভীর মুখে বলে—আমার কি ভয় হয় জানো ?

—কী ?

—তোমাকে দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, এ যেন ঠিক জোড় মেলেনি। তোমাদের মধ্যে অনেক তফাৎ।

—হবে।

—বৌদি, তোমাদের খুব ভাব হোক, তোমরা দুজন দুজনকে খুব ভালবেসো।

বনলতা ম্লান মুখে একটু ঠাট্টার চেষ্টা করে—ভালবাসারই তো বিয়ে!

—তাই তো ভয়!

—তাই তো ভয় মানে ?

—ভালবাসার বিয়েকে আমি একদম বিশ্বাস করিনা। ভালবাসাটা বড্ড পল্‌কা জিনিষ।

বনলতা রেবার গালে ঠোসা দিয়ে বলে—এত জানলে কী করে ?

—জানি। আজকাল সবাই সব জানে। আমি এ বয়সে ছুটো লাভ অ্যাফেয়ার কাটিয়ে এসেছি।

—ছুটো?

—ছুটো।

বনলতা হালকা গলায় বলে—আর আমি একটাই কাটিয়ে আসতে পারলাম না।

রেবা নিস্পলক চোখে বনলতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে—একটা?

—একটা।

ইস্ বৌদি, প্রেমের ব্যাপারে তোমার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিলনা, না,?

—না রেবা।

রেবা দুঃখিত মুখে আস্তে করে বলল—তাই।

—তাই কী?

—তাই বেছে নেওয়ার সুযোগ পাওনি।

বনলতা হঠাৎ বলল—তোমার দাদার সম্পর্কে তুমি এত হতাশ কেন?

—হতাশ। না, হতাশ হবো কেন? আমি শুধু দাদার স্ট্যাটাস আর পার্সোনালিটির একটা তুলনা করছি তোমার সঙ্গে। মিলছে না।

বনলতা মনে মনে রেবাকে ভয় পাচ্ছিল। মেয়েটা গন্ধ পায়। বুদ্ধিও রাখে। হয়তো স্থির বুদ্ধি নয়, তবু ওর অনুভূতি প্রখর।

হঠাৎ রেবা বনলতার দিকে চেয়ে একটা পরিস্কার স্বচ্ছ হাসি হাসল। ঐ হাসিটা এতক্ষণের সব কথাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল যেন। আচমকা রেবা বলল—এইজন্যই আমি জীবনে কখনো সুখী হতে পারবনা, জানো?

—কি জন্য?

—আমি ভীষণ খুঁতখুঁতে। আর আমার ভীষণ বুদ্ধি। ছুয়ে মিলে আমি মেয়ে হিসেবে ভীষণ বেমানান। কোনো পুরুষই

আমার মনের মতো হয় না। এত বেশী খুঁত খুঁতে হওয়া ভাল নয়।
তা ছাড়া আমি অনেক কিছু টের পাই যা আমার মা-বাবা- তার।
কেউ টের পায়না। একবার রিদিক

—কী টের পাও? তামার রে জলটা

রেবা গুচ্ছ হাসিটা মুখে রেখেই বলল— কটে দেওয়া
আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, তোমাকে ধরে দয়া ই ফুলে উঠে
আমরা পাবোনা। তুমি ঠিক তোমার ভেষজের বাগান চুলোয় তো

ফেঁপে উঠল বনলতা। মেয়েট।

রেবা একটা শ্বাস ফেল ইট, কাঠের কুঁদো, পুরোনো টিন এসব নানা
চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বল কাদায় জলে একটা বাঁধ দেওয়ার বৃথা
একটুও দুঃখ হয়নি। হেসে আকুল। তারা বলে—পুরো

বনলতা অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়িয়ে ব জায়গায় বাঁধ তুললে জল
একা পড়ে গেছে।

রেবা মুখ তুলে হাসল। হাসতেই থাকল।

দুদিন জোর বৃষ্টি নেমে শীত পড়ে গেল প্রায়। পুজোর এখনো বেশ দেরী, তবু রানাঘাটের আশে পাশে কুয়াশা নামে, শিশির পড়ে।

বৃষ্টিতে এবার পুকুর ভরে বিশুর পোলট্রির ভিতরে জল এসে গেল। মুর্গীর মস্তো খাঁচাটার তলায় এক কি দুই ইঞ্চি নীচেই জল। বাগানের দিকটায় পাঁচ লরী মাটি ফেলেছিল সে, পুরোনো মাটির রস কষ শুকিয়ে গেছে, গাছ পালা তেমন বাড়েনা। একটা কবিরাজী কোম্পানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিল বিশু, কালমেঘ, ফুলেখাড়া, বাসক, বুড়ো নিমের শিকড়, এমনি আরো নানা গাছ-গাছড়া সাপ্লাই দেবে। ভেষজের গাছ করলে লাভ বেশী। জমিও তাই আর একটু বাড়ানোর ইচ্ছে ছিল। পোলট্রির পিছন দিকটায় একটা মজে-আসা মস্ত পুকুর, সেটার মালিক মুর্শিদাবাদের এক মুসলমান লোক। এখানে থাকেনা। ফলে পুকুরের ধারে ধারে মাটি ফেলে আশে পাশের লোকেরা একটু একটু করে এনক্রোচ করে নিচ্ছে। বিশুও করেছে খানিকটা। ভেষজ করতে গেলে এক লপ্তে অনেকটা জায়গা দরকার। বুড়ো মুসলমানটা মাঝে মাঝে তদারকীতে আসে, এসে অসহায়ভাবে পুকুরটাকে ক্রমশঃ ছোটো হতে দেখে যায়। লোকে এমনিতেই জমি দখল করে নিচ্ছে, কাজেই কারো কেনার গরজ নেই। বুড়ো লোকটা বিক্রী করতে চেয়েছে অনেকবার, পারেনি। বিশু ঠিক করেছিল, এবার বুড়ো এলে কিছু থোক টাকা ধরে দিয়ে দশকাঠার মতো জমি নিয়ে হাসিল করবে। পুকুর বলে সস্তাও হবে, বুড়ো ফাঁদে পড়ে ছেড়েও দেবে। কারণ জমি এমনিতেই বেহাত হচ্ছে। বৃষ্টির পর সেই পুকুরের অবস্থা দেখে একটু দমে গেল বিশু। পাঁচ লরী মাটি বৃষ্টিতে ধুয়ে নিয়ে গেছে। পয়সাটা জলে গেল। মাছের চাড়া ছেড়েছিল কিছু, ভেসে গেছে।

সকালে বিশু মুনিষ জন নিয়ে পুকুরটার ভিতরে জলে একটা বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা করছিল। জলে কাদায় মাখামাখি অবস্থা তার। বাঁধ না দিলে তার ঘরের ভিত ডুবে যাবে এর পর। চারিদিক থেকে পুকুরে মাটি পড়ে পড়ে জল ফুলে উঠছে। পাম্প করে জলটা বের করে দেওয়ার কথা কেউ ভাবেনি, নালা-টালাও কেটে দেওয়া হয়নি। কাজেই পুকুরের জমা জল এখন বৃষ্টি পেলেই ফুলে উঠে চারিদিক ভাসায়। এরকম চললে ভেষজের বাগান চুলোয় তো যাবেই, পোলট্রিও তুলে দিতে হবে।

সারা সকাল ভাঙা ইঁট, কাঠের কুঁদো, পুরোনো টিন এসব নানা জিনিষ দিয়ে ভুস্‌ভুসে পচা কাদায় জলে একটা বাঁধ দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করেছে সে। মুনিষরা হেসে আকুল। তারা বলে—পুরো পাড়টা বাঁধাবেন তবে তো। একটুখানি জায়গায় বাঁধ তুললে জল আটকাবেনে।

কোনোক্রমে বাঁশের খোঁটা পুঁতে ইট ফেলে, টিন খাড়া করে একটা কিম্ভূত কিমাকার বাঁধ দাঁড় করিয়ে বিশু এসে হাত পা ধুচ্ছিল। দুটো মুর্গীকে ঝিমুনী ধরেছে। তাদের খাঁচা থেকে বের করে ফেলে রাখা হয়েছে চালা ঘরে। কেটে কুটে বাজারের হোটেলে পাঠিয়ে দেবে। আর কটা মুর্গীর ঝিমুনী লাগতে পারে সেটা চিন্তা করতে করতে বিশু ঘরে এসে গামছা নিয়ে স্নানে বেরোতে যাবে, ঠিক সে সময়ে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল মেঘলা আকাশের নীচে ছাইরঙা আলোয় চালতা তলার রাস্তা দিয়ে একটি বাহারী মেয়ে আসছে। কমলা রঙের শাড়ি, গায়ে একটা বাটিকের কাজ করা খদ্দরের চাদর, হাতে বেঁটে ছাতা। গাছপালার ভিতরে মুখটা দেখা যায়না, কিন্তু গায়ের অসম্ভব ফর্সা রঙটা ঝিলিক দেয়।

বিশু এক লাফে বারান্দা থেকে নামল। সামনের ছোট্ট জমিটা পার হয়ে গেট খুলে দুহাত ওপরে তুলে চেঁচিয়ে বলল—বনা!

বনলতা চারদিকে চাইছিল, বিশুকে দেখে হাসল একটু।

—কর্তাকে নিয়ে এলিনা ?

বনলতা কাছকাছি এসে ভ্রু কুঁচকে একটু দেখেই বলল—একেবারে গাঁইয়া হয়ে গেছিস !

—একেবারে।

—তোর মাছ আর হাঁস মুর্গী দেখতে এলাম।

বিশুর মাথা থেকে তেল গড়িয়ে নামছে, গায়েও তেলমাখা হাতের থাবড়া দেখা যাচ্ছে, ডলা মারার সময় পায়নি। ঘরে এনে বিছানায় বনলতাকে বসিয়ে বলল—বোস, দুটো ডুব মেরে আসি।

বনলতা দম নিয়ে বলল—বিশু, তিনটে তিরিশের গাড়িতে তুই আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবি।

—কেন ?

—কাজ আছে।

—কী কাজ ?

—স্নান করে খেয়ে নে তাড়তাড়ি। বলছি।

বিশু বনলতার মুখখানা একপলক দেখে ঘাড় হেলিয়ে বলল—বনা, তোকে খুব হ্যাপী দেখাচ্ছে। কোনো খারাপ কিছু হয়নি যে সে সম্পর্কে আমি সিওর।

—খারাপ কী হবে ?

একটু দোনোমোনো করে বিশু বলল—তোর সম্পর্কে কেবল খারাপ চিন্তা আসে। সেদিন তোর বাড়িতে গিয়ে তোকে ভাল দেখে আসিনি বনা।

বনলতা হাসছিল। বলল—খারাপের কী ! ভালই আছি।

—না, তুই ভাল ছিলিনা সেদিন, আজ তোকে ভাল দেখাচ্ছে।

—তুই ডুব দিয়ে আয়।

—তুই দুটো ভাত খাবি আমার সঙ্গে বনা ? ডিমের ওমলেট করব, ভাল মাছ আছে খাবি ?

বনলতা মাথা নাড়ে—না রে।

বিশু মায়াময় চোখে তাকিয়ে বলে—তুই বরাবর কম খাস, কিছু খেতে চাস না কখনো।

—তুই যা তো।

বিশু গেল। আনন্দে সে শিস্ দিচ্ছিল। তার হাত পায়ে এক আনন্দিত চঞ্চলতা। পুকুরের বাঁধ, বা মুর্গীর ঝিমুনী রোগের কথা সে একদম ভুলে গেল। বাচ্চা যে ছেলেটা বিশুর সব কাজকর্ম করে সে ছিপ নিয়ে বসে ছিল পুকুরের ধারে। তার পিঠে দুই থাবড়া মেরে বিশু তুলে দিল। বলল—দৌড়ে যা, ঘরে এক দিদিমনি বসে আছে দেখবি, আমার বোন হয়। তাকে এক কাপ দুধ গরম করে দিবি। দুধ খেতে না চাইলে চা করে দিবি। যা।

ছেলেটা দৌড়োলো।

বিশু ঝাঁপ দিল জলে।

তিনটে তিরিশের গাড়িটা পেয়ে গেল তারা। রাণাঘাট লোকাল প্রায় ফাঁকাই এ সময়, বিশু বনলতাকে জানালার ধারে বসাল, চীনেবাদাম কিনে এনে দিল একরাশ। স্টেশনে চেনা লোক অনেক। গাঁ গঞ্জের লোক সব, কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না। জিজ্ঞেস করে—সঙ্গে উটি কে গো বিশুদা?

বিশু তার গরবী মুখখানা তুলে বলে—বোন হয়।

—তোমার তো তিনকূলে কেউ—

কথা শেষ হয় না, বিশু প্রায় ধমকে বলে—এইটুকু বেলা থেকে আমরা একসঙ্গে মানুষ, রক্তের সম্পর্কের চেয়ে বড় সম্পর্ক।

তারপর চাপান সারের কথা আসে, পাম্পসেট ভাড়ার কথা আসে, অস্ট্রেলিয়ান গো-বীজের কথা উঠে পড়ে। নানাজনের সঙ্গে এরকম ইণ্টারভিউ দিতে দিতে গাড়ির ভোঁ বাজে। বিশু লাফিয়ে

গাড়িতে ওঠে। বনলতার পাশে বসতে বসতে তৃপ্ত মুখে বলে—সবাই চেনে আমাকে।

—তাই দেখছি। বলে বনলতা হাসে। চীনে বাদাম আঙুলের চাপে ভাঙতে পারে না বনলতা, দাঁতে কামড়ে ভাঙ্গে।

দেখে বিশু ভ্রূ কুঁচকে বলে—কত জীবাণু থাকে খোসায়।

—তো তুই ভেঙে দে।

বিশু খোসা ছাড়িয়ে দিতে থাকে। বনলতা সস্নেহে ওর দিকে চেয়ে থেকে বলে—গাঁইয়া কোথাকার!

—কী কথা বলবি বলছিলি যে!

বনলতা, এতক্ষণ সব ভুলে ছিল। এবার মনে পড়ে গেল—বনলতা, জগন্নাথ, বিয়ে। সব। একটা শ্বাস ফেলে বলল—তেমন কিছু না। তুই আজ একবার বাবার কাছে যা।

—গিয়ে?

—তুই বলিস, বনলতা একবার দেখতে চায় আপনাকে। একবার একটুক্ষণের জন্য।

বিশু উদাস মুখ করে বসে রইল একটু।

তারপর বলল—বলার কী! তুই সোজা বাড়িতে চল্ না। তাড়িয়ে তো দেবেনা!

বনলতা মাথা নাড়ল—না। সে ভারী লজ্জা করবে আমার, তার ওপর প্রেশারের রুগী, হঠাৎ আমাকে দেখে যদি ব্যস্ত হয়ে পড়ে?

—তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু তুই হঠাৎ বুড়োকে দেখতে চাস কেন?

—এমনিই। প্রায় রাত্তিরে আমি বাবাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখি।

—স্বপ্ন স্বপ্নই।

বনলতা বাদাম খাওয়া বন্ধ করে বাইরের চলমান প্রকৃতির দিকে খানিক চেয়ে রইল। তারপর হাতের দলাপাকানো রুমাল তুলে চোখের ওপর চেপে ধরল একটু।

গলাটা ধরে গেছে, যখন কথা বলল তখন লক্ষ্য করল বিশু।

বনলতা বলল—তা ছাড়া আমি বার্ণপুরে একটা মাস্টারী নিয়ে চলে যাচ্ছি। সামনের মাসে জয়নিং ডেট। কলকাতায় আর আসা হবে না।

বিশু চমকে বলে—কোথায় চলে যাচ্ছিস?

—বার্ণপুর।

—কেন বনা?

—তোদের প্রফেসর বোস বিলেত চলে যাচ্ছে। একা আমি কোথায় থাকবো? ওরা অবশ্য আমাকে শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়, গতকাল আমার শ্বশুর শাশুড়িও এসেছিল সেই কথা বলতে। কিন্তু আমি যাবো না।

—যাবিনা কেন?

—এমনিই। বড় সংসারে থাকতে আমার ভাল লাগবেনা। তার চেয়ে বাইরে মাস্টারি নিয়ে থাকতে ভালই লাগবে। হস্টেলে ওরা জায়গা দেবে লিখেছে।

বিশু একটু ভেবে বলে—কাজটা ভেবেচিন্তে করছিস তো?

বনলতা আস্তে আস্তে বলল—ভাবনা চিন্তা করার মতো মাথার জোর আর আমার নেই। কী করছি, ভাল না মন্দ কে জানে! আমার হয়ে ভাববারও তো আর কেউ নেই। কাজেই, যা ভাল বুঝছি করছি। যা হওয়ার তা হবে।

বিশু হঠাৎ সচেতন হয়ে বলে—কাকাবাবুর কাছেই ফিরে যা না বনা!

—বাবা আমাকে আর নেবে না।

—কে বলল? আমি গিয়ে রাজি করাবো। আজই।

বনলতা ম্লান হাসে—আমি বাবারই মেয়ে বিশু। জেদ আমারও কিছু কম নয়। বাবার কাছে আমি থাকব না। শুধু বলিস একবার দেখতে চাই। বাড়িতে ঢুকবোও না। বাবা বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি নীচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে এক মিনিটের জন্য দেখে নেবো।

বিশুর চোখ ছল্‌ছল্‌ করছিল। সে বলল—কী সব বলছিস? অত নাটক করার দরকার নেই। চল্‌ আজই তোকে কাকার কাছে নিয়ে যাই।

—দূর বোকা! এতক্ষণ তবে কী বললাম তোকে? বাবা আমাকে দেখলেই উত্তেজনায় হঠাৎ একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে।

বলে বনলতা আবার চোখ চেপে ধরে রুমালে। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না।

বিশু অপেক্ষা করে।

তারপর এক সময়ে বলে—বোস সাহেবের সঙ্গে তোর কিছু হয়নি তো?

—কী হবে? কিছু হয়নি।

—বোস সাহেবের জন্য একদিন সব ছেড়েছুড়ে এলি, কাকাবাবুর কথা তখন তো ভাবিসনি বনা! আজ আবার কাকাবাবুর জন্য অস্থির হয়েছিস। তার মানে যার মুখ দেখে সব ভুলে ছিলি, তার মুখ এখন আর তোকে ভুলিয়ে রাখতে পারছে না।

বনলতা তার লালচে চোখ তুলে বিশুর দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ একটু হাসে।

বলে—তোকে যতটা গাঁইয়া ভেবেছিলাম ততটা তুই নোস তো! কী সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলছিস!

—ইয়ার্কী দিস না বনা। আমি সিরিয়াসলি বলছি। বোস সাহেবের সঙ্গে তোর কিছু হয়নি তো?

—না রে! ভদ্রলোকদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয় না। তাদের সম্পর্ক খুব ভদ্র থাকে, কেবল ভিতরে একটা সুইচ অফ্‌ হয়ে যায়। টেরও পাওয়া যায় না।

বিশু কথাটা না বুঝে তাকিয়ে রইল।

বনলতা জানালার ধারে মাথাটা হেলিয়ে বলে—অনেকটা ট্রেন জার্নি করেছি, আজ আর আমাকে বকাস না বিশু। আমি একটু

চোখ বুজে থাকি।

—থাক। বলে বিশু সাবধানে শাটার বন্ধ করে দিচ্ছিল।

—বন্ধ করছিস কেন?

—এ লাইনে মাঝে মাঝে চাষার ছেলেরা গাড়িতে পাথর ছুঁড়ে মারে।

বনলতা স্নিগ্ধ হেসে চোখ বন্ধ করল।

শিয়ালদা থেকে ভুজন আলাদা হয়ে গেল।

বিশু যাওয়ার সময়ে বলল—বড্ড নাটুকে ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে রে। কাকাবাবুকে ঐ বারন্দায় দাঁড়ানোর কথা বলাটা যে কী শক্ত কাজ!

বনলতা হাসল, বলল—শক্ত কাজ বলেই তো তুই পারবি। তুই সোজা কাজ কবে পেরেছিস?

—তবু, বড্ড যাত্রার ঢঙের ব্যাপার হয়ে যাবে। বরং তুই একদিন বাড়িতে আসতে চাস, সেই কথা বলে আসবো।

—না বিশু, আমি বাড়িতে ঢুকবো না।

বিশু হাসল, বলল—পাগল!

শীতের বেলা টপ করে ফুরিয়ে যায়। শিয়ালদার জ্যাম্ পার হতে হতেই বিশুর সন্ধে হয়ে গেল। যখন বনলতাদের বাড়ীতে পৌছালো তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরতলায় এল। সদরটা খোলা। বোধহয় দরজা খুলে রেখে বাচ্চা চাকরটা কোথাও গেছে। ঘর অন্ধকার।

সামনের ঘর পার হয়ে বিশু ভিতর দিককার ঘরে এল।

জানালার কাছে ইজিচেয়ার। তাতে আধশোয়া বসে আছেন বনলতার বাবা। আবছা দেখা যায়, আঙুলের ফাঁকে অন্যমনে ধরে থাকা সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে। পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া।

বিশু ডাকলনা। চেয়ে রইল। লোকটা এখন বনলতার কথা ভাবছে বোধহয়।

বিশু একটা দীর্ঘ শ্বাস খুব নিঃশব্দে ছাড়ল। দৃশ্যটা দেখতে তার খুবই ভাল লাগে। বড্ড করুন আর বড্ড সুন্দর। দৃশ্যটা ভেঙে দিতে ইচ্ছে হয়না।

কিন্তু বিশুকে ফিরতে হবে। রাত আটটার ট্রেণটা ধরতে না পারলে বড্ড অসুবিধে। ঝিমুনী লাগা মুর্গী দুটোর ব্যবস্থা করে আসেনি। অনেক কাজ পড়ে আছে।

বিশু ইজিচেয়ারের পিছন দিকটায় হাত রেখে ডাকল—কাকাবাবু!

উনি চমকে মুখ ফেরালেন—কে?

—আমি বিশু।

—ও। কী খবর?

—ভালই। কেমন আছেন?

—খারাপ কী?

বিশু হাসল।

—আজ অফিসে যাননি?

—গিয়েছিলাম। কামাই বড় একটা করিনা।

বিশু আর কথা খুঁজে পেলনা।

বনলতার বাবাই আবার বলেন—কাল বেরিয়ে পড়ছি।

—কোথায়? বিশু একটু অবাক হয়ে বলে।

—প্রথমে বেনারস। তারপর উত্তরে, হিমালয়ের দিকে। দিল্লী আগ্রা ঘুরে মাস দুই পরে ফিরবো, যদি বেঁচে থাকি।

—হঠাৎ বেরোচ্ছেন কেন?

—একা ভাল লাগেনা।

—যাওয়ার আগে বনলতাকে একটা খবর দেবেন না?

উনি মুখ তুলে অন্ধকারেই বিশুর দিকে তাকানোর চেষ্টা করে বললেন—তাকে জানানোর কী? সে কি জানতে চায়?

—চায় কাকাবাবু। বনলতা আপনার জন্য বড় কান্নাকাটি করে।

—তুই কি সেখানে যাস?

—যাই।

—ঘরদোর কেমন দেখলি? ভাল আছে?

—আছে।

—তবে আর কী।

বলে উনি চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবেন। তারপর মুখ তুলে বলেন—বিয়ের পর মেয়েরা যত তাড়াতাড়ি পর হয়ে যায় ততই ভাল। বাপের বাড়ির টান থাকলে মেয়েরা সুখী হয় না। বনার সঙ্গে কখনো দেখা হলে কথাটা আমি বলেছি বলে বলিস।

—বলব।

—সেই ছোকরাটা কি প্রফেসারী করে? কেমন ছেলে?

—ভালই।

বনার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?

—ভাল।

—তবে বনা কাঁদে কেন? কাঁদতে বারণ করিস। বেশী কান্না-কাটি করলে ছোকরাটা হয়তো ভাববে বনার বাপের বাড়ির টান বেশী রয়ে গেছে। পুরুষেরা চায় তাদের বৌ একেবারে তাদেরই হয়ে যাক।

—তাই কি হয়? বনা আপনার কাছে একবার আসতে চায়।

—তার আর সময় কৈ? কাল বিকেলে আমার গাড়ি।

—যদি অনুমতি দেন তো কাল সকালে ওকে নিয়ে আসি। বাইরের রাস্তায় ও দাঁড়াবে, আপনি বারান্দা থেকে ওকে দেখা দেবেন।

উনি সবিস্ময়ে মুখ তুলে বলেন—বাড়িতে আসতে পারে। তবে কাল সারাদিন আমার অনেক কাজ। অফিসেও যেতে হবে।

—ওর বর বিলেতে চলে যাচ্ছে। তিনচার বছরের জন্য।

—বিলেতে! কেন?

—ফর হায়ার স্টাডিজ।

উনি চুপ করে থাকেন। একটু পরে বলেন—বনা কোথায় থাকবে? শ্বশুর বাড়িতে? নাকি সেও সঙ্গে যাচ্ছে?

—না। বনা চাকরি নিয়েছে বার্ণপুরে, মাষ্টারি।

উনি আবার চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন—কৌশিকও বিলেতে গেছে।

—কে?

—কৌশিক। ছেলেটার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। বড় ভাল ছেলে ছিল।

—জগন্নাথও ভাল ছেলে।

উনি শ্বাস ছেড়ে বলেন—হবে। আজকাল ভাল ছেলেতে দুনিয়া ভরে যাচ্ছে। সবাই ভাল।

—বনাকে কি কাল আনবো?

—না।

—কেন?

—আমার সুন্দর মেয়েটাকে যদি একটু রোগা বা একটু বিমর্ষ দেখি তবে আমার মাথায় আগুন জ্বলে যাবে। তার চেয়ে না দেখাই ভাল। কষ্টটা প্রায় সয়ে এসেছে। এটাকে আবার বাড়াতে দেওয়া ঠিক হবে না।

—আপনি কি এখনো একটুও ক্ষমা করেননি?

উনি চুপ করে হাতের ওপর থুঁতনী রেখে সামনে চেয়ে রইলেন একটু। তারপর বললেন—আমি ক্ষমা করার কে? বামুন কায়েতে বিয়ের নিয়ম নেই, সেটা বহু যুগের প্রথা। সে নিয়ম ভাঙার

অধিকার আমার নেই। কেউ যদি ভাঙে তাকে আমি ক্ষমা করার অধিকারীও নই। সে সমাজের কাছে অপরাধী। আমার ক্ষমায় কী যায় আসে?

—নিয়মটা আজকাল সবাই ভাঙছে, ঘরে ঘরে হচ্ছে।

—নিয়মটা লোকে ভাঙছে, তবু নিয়মটা কিন্তু আছেই। পাল্টে যায়নি। বিধান কি লোকের ইচ্ছেয় বদলায়?

—বনা যদি সুখী হয় তবে?

—বনাকে কি তুই সুখী দেখলি?

বিশু একটু ইতঃস্তত করে। বলে—সুখীই তো!

তবে কাঁদে কেন?

—সে আপনার জন্য।

—আমার জন্যই বা কাঁদে কেন? বাপের বাড়ির জন্য কোন্ মেয়ে দিনের পর দিন কাঁদে? বরং বিয়ের পরই তারা কিছুদিন খুব সুখে থাকে, স্বামীর আদর-সোহাগ নতুন সংসারে নতুন লোকজনের সঙ্গে মেলা মেশা-এসব তো বড় সুন্দর ব্যাপার। বনা তবে কাঁদে কেন?

বিশু চুপ করে থাকে।

উনি গম্ভীর গলায় বলেন—বনা সুখী নয়।

বিশু একটু চমকায়।

উনি আবার বলেন—কিন্তু সেটা আমার কাছ ছাড়া হয়ে আছে বলেও নয়। আমি সবই টের পাই।

বিশু মেঝের ওপর অনেকক্ষণ বসে রইল।

বাচ্চা চাকরটা ফিরে এসেছে। বাইরের ঘরের বাতি জ্বলল। রান্নাঘরের টুকটাক শব্দ আসছে। দরজা বরাবর ওঘর থেকে একটা বাঁকা চৌকো আলো এসে এ ঘরে পড়েছে। তার ক্ষীণ আলোর আভায় বিশু দেখে কাকাবাবুর মুখখানা বড় উদাসীন, যেন বা পৃথিবীর সব প্রিয়জনের মুখ ভুলে-যাওয়া এক বৈরাগ্য। প্রকৃত এক

তীর্থযাত্রীর মতো দেখাচ্ছে তাঁকে।

বিশু আচমকা জিজ্ঞেস করে—বনার কী হবে কাকাবাবু?

উনি তেমনি অচঞ্চল ভাবে আস্তে বললেন—বিশু, বনা কখনো সুখী হবেনা।

—কেন?

—ওর ভাগ্য। বড় বেশী আদরে মানুষ করেছি বলে ও একটু স্বেচ্ছাচারী হয়েছিল। এখন কর্মফল ভোগ করছে। আমিও করছি তুই মাঝে মাঝে ওকে দেখতে যাস।

—যাবো।

বিশু উঠল। শরীরটা বড় ভার লাগছে তার। মনটা অন্ধকার। একটু জ্বর জ্বর ভাব।

বলল—চলি, কাকাবাবু।

—আয়।

বনলতাকে একবার খবর দিয়ে গেলে হত, একবার ভাবল। তারপর ভাবল—থাক, কিছুটা সময় বনলতা অপেক্ষাকৃত সুখে থাক। তারপর তো জানবেই।

॥ এগারো ॥

ঘর ফাঁকা, গতকাল বনলতা বার্ণপুরে চলে গেছে।

আসবাবপত্রগুলো জলের দরে বেচে দিয়েছে জগন্নাথ। কিছু বাসনপত্র বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। জগন্নাথ মেঝেতে বিছানা পেতে শোয়। তার সুটকেস ট্র্যাটকেস সব গোছানো হয়ে গেছে। পরশুদিন দমদম থেকে তার প্লেন ছাড়বে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। এ কয়দিন তাকে বাড়িতে থাকার জন্য মা বাবা বারবার বলেছিল। জগন্নাথ রাজি হয়নি। তার আর বনলতার সম্পর্ক নিয়ে পাছে কোনো প্রশ্ন ওঠে।

বনলতার কথা দীর্ঘ সময় ধরে মনে পড়ে।

দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে জগন্নাথ সিগারেট ধরিয়ে আধশোয়া হয়ে বসেছিল। ফাঁকা ঘরটা কী ভীষণ বিষন্ন লাগছে। রোদ-মরা আলোয় ঘরটায় ঘুলিয়ে উঠছে অন্ধকার। জগন্নাথ চেয়ে থাকে। অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

সেদিন তারা সদ্য এক ঘরে প্রথম থাকছে। এক বিছানায় দুজনের মধ্যে কোনো সংশয়ের লেশমাত্র ছিলনা। কত এলো-মেলো, পাগলাটে ভালাবাসার কথা বলেছিল তারা। তারপর এসেছিল সেই সময় যখন তারা শরীরে শরীর দিয়েছিল। সেই প্রথম আনন্দময় উন্মোচনের মুহূর্ত্তে, সুন্দর ক্ষণটিতে হঠাৎ বনলতা একটা অস্ফুট চীৎকার করেছিল, ঠেলে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল জগন্নাথকে। জগন্নাথ ঠিক বুঝতে পারেনি কী হয়েছিল। সে ছাড়েনি। আর তখন হঠাৎ জগন্নাথকে চমকে দিয়ে বনলতা তার কোমরে একটা লাথি মেরেছিল, বলেছিল—এত পশু কেন তুমি?

বড্ড অপ্রস্তুত হয়েছিল জগন্নাথ, অপমানে, লজ্জায় উঠে বসে সে তাড়াতাড়ি তার শরীর ঢেকে বসে রইল। অনেকক্ষণ ধরে হাঁফিয়েছিল

বনলতা। ঘামা মুখে ফ্যানের তলায় বসে উদভ্রান্তের মতো চেয়ে রইল সামনের দেওয়ালে। তারপর জল খেয়ে শান্ত হয়ে বলল—আমার এসব করতে ঘেন্না হচ্ছে।

জগন্নাথ কথা বলেনি।

বনলতা হঠাৎ মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে বলল—ভীষণ নোংরা লাগছে, বুঝলে!

জগন্নাথ ভেবেছিল, অভিজ্ঞতার অভাব আর শৈশব থেকে লালিত সংস্কারই এর কারণ। সে বলেছিল এটা স্বাভাবিক ব্যাপার এতে নোংরামীর কিছু নেই বনলতা।

বনলতা অনেকক্ষণ কেঁদে বলল—জানি। আমার কোনো গোঁড়ামীও নেই। কিন্তু হঠাৎ ঐ সময়টায় আমার ভিতরে কী যেন হচ্ছিল—

—কী?

—ঠিক বোঝাতে পারবনা। কী একটা যেন ভেঙেচুরে যাচ্ছে, কারা যেন আমার ভিতর থেকে চীৎকার করে বলছে—একাজ কোরোনা, এ মহাপাপ।

জগন্নাথ একটু হেঁসে বলেছিল—ওসব ভিশন। তোমার কল্পনা।

তারপর ধীরে ধীরে তারা ব্যাপারটা স্বাভাবিক করে ফেলেছিল। বনলতা আর পাগলামী করতনা।

কিন্তু বনলতার সেই লাথিটার কথা কোনোদিনই জগন্নাথ ভুলবে না।

আজ সেই ঘটনাটা বড্ড বড় হয়ে জগন্নাথের মনটাকে আচ্ছন্ন করল। সে ভাবতে লাগল, বনলতাকে সম্পূর্ণ পাওয়ার মুহূর্তে সেই রূঢ় প্রত্যাখ্যান? তারপর আবার তাকে নিয়েছিল বনলতা। নাকি সে ঠিক গ্রহণ নয়? তবে কি প্রতিটি রতিক্রিয়াই ছিল বনলতার আত্মবিসর্জন?

জগন্নাথ জেনে গেছে, বনলতার ঘরে তার আর ফেরা হবেনা।

ভাগ্য ভাল, বনলতা আজও সন্তানসম্ভবা হয়নি। হলে ঝামেলা হত। বনলতার সঙ্গে প্রায় অকারণেই বোধ হয় তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, জন্মের শোধ। কিংবা ঠিক অকারণেও নয়! গূঢ়নিহিত কোনো কারণ ছিলই যা বুঝতে অনেকদিন সময় লাগবে।

সহজে ফিরবেনা জগন্নাথ। সে যাবে দূরে। আরো বহু দূরের নিকটে। সেই সংস্কৃত শ্লোকটা তার কেবলই মনে পড়ে। হে অচ্যুত, দুই দলের মাঝখানে আমার রথ স্থাপন কর, আমি দেখি কিভাবে যোদ্ধৃবৃন্দ অবস্থান করছে, আজকের সমুদ্যত রণে কার সঙ্গে আমার যুদ্ধ! অবশ্যম্ভাবী এই শ্লোকের সঙ্গে অরিজিতের মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গরঠিকানিয়া অরিজিৎ, ভবঘুরে, পৃথিবীর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে বেরিয়ে পড়েছিল।

জগন্নাথের সুখের আড়াল গেছে সরে। সামনে মহা পৃথিবী। অবারিত। মানুষের সমাজ। ঘর ভাঙার দুঃখ থাকে থাক। জগন্নাথ একবার সেই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াবে। মৃত্যুর আগে অন্তত এক মুহূর্তের জন্যও সে নিজেকে সঠিক অনুভব করতে চায়।

সিগারেটটা ফেলে দিল জগন্নাথ। হাসল একা একা। বড় ভাবপ্রবণ হয়ে যাচ্ছে সে। বয়স হচ্ছে না তোমার, জগন্নাথ? যে বয়সে লোকে ঘরে ফেরে সেই বয়সে ঘর ছাড়ার কথা কেউ ভাবে?

অরিজিৎ একটি মেয়েকে পছন্দ করে এসেছে বনগাঁ থেকে। শীগগীরই বিয়ে। জগন্নাথ সাদা দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে রইল। মুখে একটু বিষন্ন হাসি। অরিজিৎ আর কখনো বেরিয়ে পড়বে না। কী আশ্চর্য! গৃহস্থ অরিজিতের কথা ভাবতে তার বড় হাসি পায়।

জগন্নাথ ভাবতে লাগল। কখনো হাসল, কখনো গম্ভীর আর বিষন্ন হয়ে গেল। তার মাথার ভিতর দিয়ে কখনো বনলতা কখনো অরিজিৎ, কখনো সেই ফটোতে দেখা কৌশিক এবং আরো কত মুখ ভেসে যেতে লাগল।

॥ বারো ॥

একটা উড়োজাহাজের শব্দ কেন যে বারবার শোনে বনলতা।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসে। ঠিক বুঝতে পারে না কোথায় আছে! তাদের এনটালির বাড়িতে, না কি জগন্নাথের সঙ্গে পাইক-পাড়ায়! ঝিমুণী কেটে গেলে খেয়াল হয়, এটা হস্টেল, এটা বার্ণপুর। বর্দ্ধমান জেলা।

ছোট্ট ঘরে দুটো বেড। অন্যটায় আর একজন মিসট্রেস থাকে। তার বড় নিঃসাড় ঘুম।

উড়োজাহাজের শব্দটা ভাল করে শুনবার জন্য বনলতা জানালায় এসে দাঁড়ায়। বন্ধ পাল্লা দুটো খুলে শিকের ফাঁক দিয়ে মুখখানা বের করে দেয় যথাসম্ভব। শীত-হাওয়া এসে লাগে, ঠাণ্ডা লোহার শিক গালে লেগে গাল কন্ কন্ করে। চোখে জল আসে। তবু প্রাণ-পণে কুয়াশার ভিতরে চেয়ে থাকে বনলতা। একটা উড়োজাহাজ অবিরল উড়ে যাচ্ছে, দূর থেকে দূরে। কিন্তু সে মিলিয়ে যায় না। শব্দটা কল্পনায় থেকে যায়। থাকে হৃদয় জুড়ে।

কাছাকাছি কোনো নদী নেই। তবু বনলতা এই মাঝরাতে দোতলার জানালা খুললে টের পায়, অদূরে এক নদী বয়ে যাচ্ছে। কী মিষ্টি তার ঝর্ণা-ঝরা শব্দ। ওপারে একটা অন্ধকার দূর পৃথিবী। বনলতা তার এই জীবনে যত মানুষকে ভালবেসেছিল সবাই সেই ওপারে রয়েছে। একটু দূরে। কিন্তু ঠিক কেউই হারিয়ে যায়নি। ততদিন হারাবে না যতদিন উড়োজাহাজের শব্দটা তার থাকবে। মস্ত পৃথিবীটা তার প্রিয়জনদের টেনে নিয়ে গেছে।

বনলতা নিঃশব্দে সাবধানে আবার জানালা বন্ধ করে ফিরে আসে। শোয়। তারপর অবিরল জলধারায় ভাসে তার চোখ। উড়োজাহাজের ম্লান শব্দটাই তাকে তখন আস্তে ঘুম পাড়াতে থাকে।